হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

মাইওয়ার প্রতিশোধ

রূপান্তরঃ ইসমাইল আরমান

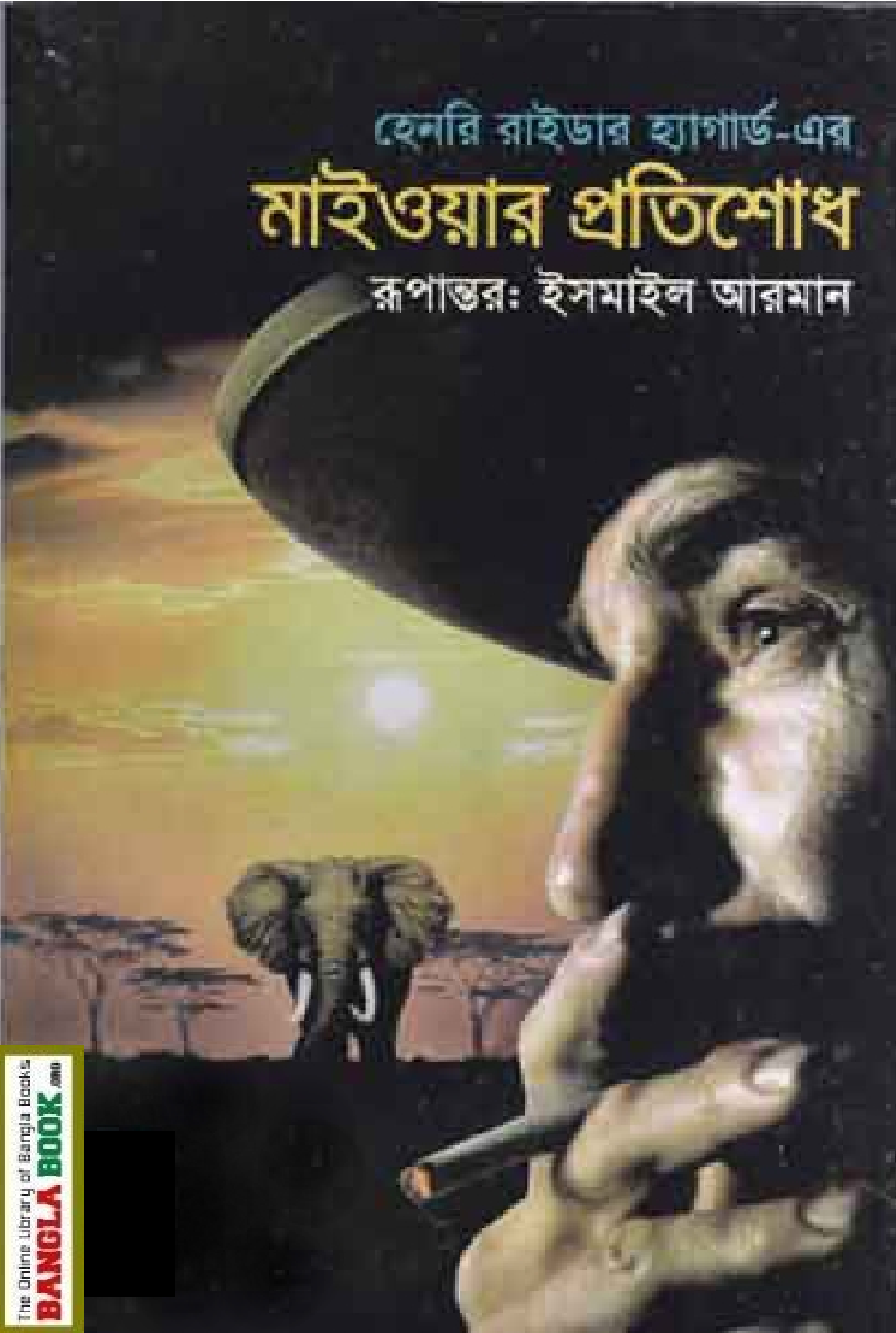

The Online Library of Bangla Books

[redacted]

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
আরেকটি চমৎকার রোমাঞ্চোপন্যাস

মাইওয়ার প্রতিশোধ

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

চলুন পাঠক, কিংবদন্তির নায়ক অ্যালান কোয়াটারমেইনের
সঙ্গে নতুন এক অভিযানে বেরিয়ে পড়া যাক।
সাত বছর আগে আফ্রিকার এক ভয়ঙ্কর এলাকায়
হারিয়ে গিয়েছিল তাঁর বন্ধু জন এভারি।
এতদিন পর সেখানেই যাচ্ছেন তিনি শিকারের আশায়।
দৈত্যাকার তিন হাতি দেখার পর থেকেই শুরু হলো ঘটনা।
খবর পেলেন, মারা যায়নি জন এভারি।
বন্দি হয়ে আছে মাটুকু জাতির নিষ্ঠুর রাজা ওয়াম্বের হাতে।
ওকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু কীভাবে?
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদিনী
এক মেয়ে—মাইওয়া। কেন? কী তার কাহিনি?
দুই জাতির রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মাঝে পড়ে গেলেন
কোয়াটারমেইন। বন্ধুকে উদ্ধার তো পরের কথা,
প্রাণ বাঁচানোই দায়।

The Online Library of Bangla Books

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখক পরিচিতি

ইংল্যাণ্ডের নরফোকে জন্মগ্রহণ করেন স্যর হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, ১৮৫৬ সালের ২২শে জুন তারিখে। দশ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ভাল কোনও স্কুল-কলেজে পড়ার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। মাত্র উনিশ বছর বয়সে নেটাল সরকারের চাকরি নিয়ে চলে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। ছ'বছর ওখানে কাটিয়ে আবার ফিরে আসেন ইংল্যাণ্ডে, আইনশাস্ত্রে লেখাপড়া শুরু করেন, পাশাপাশি মনোনিবেশ করেন লেখালেখিতে। ফলে পৃথিবী পায় ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখকদের একজনকে। একের পর এক চমকপ্রদ কাহিনি তিনি উপহার দিতে থাকেন পাঠকদের জন্য। চাকরিসূত্রে আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন হ্যাগার্ড, সেসব অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর বইগুলোর প্রধান উপজীব্য।

হ্যাগার্ডের বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে *কিং সলোমন'স্ মাইনস্*, *শী*, *রিটার্ন* অভ *শী*, *অ্যালান কোয়াটারমেইন*, এবং *দ্য পিপল* অভ *দ্য মিস্ট* অন্যতম। টগবগে উত্তেজনায় ভরা বইগুলো পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠার উপায় থাকে না। ভাইয়ের সঙ্গে বাজি ধরেছিলেন হ্যাগার্ড—*ট্রেজার আইল্যাণ্ড*-এর চেয়ে রোমাঞ্চকর বই লেখার ক্ষমতা তাঁর আছে, এবং *কিং সলোমন'স্ মাইনস্* লিখে সত্যিই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সেটা। বইটি প্রকাশ পাবার পর

রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে *মন্টেজুমা'স্ ডটার*, *মর্নিং স্টার*, *পার্ল মেইডেন*, *দ্য ব্রেদ্রেন*, *অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার*, ইত্যাদি।

নানা সময় নানা রকম পেশায় জড়িত ছিলেন হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, রাজনীতির প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। ১৯১২ সালে স্যর উপাধি পান। ১৯২৫ সালের ১৪ মে পরলোকগমন করেন এই কালজয়ী সাহিত্যিক।

The Online Library of Bangla Books

মাইওয়ার প্রতিশোধ

এক

গোবোর বিদ্রোহ

তিন সিংহ আর জিম-জিমের মৃত্যুর করুণ কাহিনি যে-দিন আমাকে শুনিয়েছিলেন অ্যালান কোয়াটারমেইন, তার প্রায় এক সপ্তাহ পরের কথা। সারাদিনের শিকার শেষে একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিলাম আমরা। ইয়র্কশায়ারে বিশাল এক এস্টেট আছে মিস্টার কোয়াটারমেইনের। পুরো দু'হাজার একর জায়গা, এর মধ্যে একশো একর জুড়ে ঘন জঙ্গল। শিকার করার জন্য একেবারে আদর্শ। দু'বছর হলো এই এস্টেটে উঠেছেন তিনি, ইতোমধ্যে ঈর্ষণীয় পরিমাণ শিকার করে ফেলেছেন ভদ্রলোক ওই জঙ্গলে। অল-রাউণ্ড স্পোর্টসম্যান হলে যা হয় আর কী, শটগান আর আট বোরের রাইফেল... দুটোই সমান দক্ষতায় চালাতে জানেন তিনি।

সেদিন তিনজন গিয়েছিলাম শিকারে—সার হেনরি কার্টিস, কোয়াটারমেইন আর আমি। কিন্তু দুপুরে চলে যেতে হয়েছে সার হেনরিকে—এজেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন; তারপর একটা খামার পরিদর্শন করবেন, ওখানে নাকি নতুন ছাউনি তৈরি করাতে হবে। ডিনারের সময় অবশ্য ফিরে আসবেন বলে কথা দিয়ে

গেছেন, ক্যাপ্টেন গুডকেও সঙ্গে নিয়ে আসার কথা। ব্রেইলি হল্ এখান থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে।

পাখি শিকার করতে গিয়েছিলাম আমরা, সে হিসেবে সারাদিনের অর্জন মন্দ হয়নি। মোট সাতাশটা শিকার পেয়েছি—তার মধ্যে একটা বনমোরগ, বাকিগুলো তিতির পাখি; পুরো একটা ঝাঁকের দেখা পেয়েছিলাম, সেটাকে ধাওয়া করে শিকার করেছি।

বাড়ি ফেরার পথে ঝোপঝাড়ে ভরা একটা ছোট জংলামত জায়গা পড়ে—বনমোরগের আস্তানা, কদাচিৎ একটা-দুটো ফিজান্ট পাখিও মেলে। ওখানে পৌছুতেই থেমে দাঁড়ালেন কোয়াটারমেইন। আমার দিকে ফিরে ভুরু নাচালেন।

'কী বলেন? বাড়ি যাবার আগে আরেক দফা হয়ে যাবে নাকি?'

মৃদু হেসে সায় দিলাম প্রস্তাবে। লাঠিসোটা নিয়ে পিছু পিছু আসতে থাকা খানসামাকে ডাকলেন কোয়াটারমেইন। নির্দেশ দিলেন ঝোপঝাড় পিটিয়ে পাখিগুলোকে বের করে আনতে।

'ঠিক আছে, সার,' বলল লোকটা। 'কিন্তু আঁধার নেমে আসছে, বাতাসও বইছে জোরে। বনমোরগ যদি থাকেও এখানে, শিকার করা সহজ হবে না। গুলিই লাগাতে পারবেন না।'

'তোমার কাজ বনমোরগ বের করে আনা, জেফরিজ,' বিরক্ত গলায় বললেন কোয়াটারমেইন। শিকার নিয়ে কেউ তাঁকে উপদেশ দিক, সেটা মোটেই পছন্দ করেন না। 'গুলি করার চিন্তা আমাদের উপর ছেড়ে দাও।'

একটু মনঃক্ষুণ্ন হয়ে পাশ ফিরল খানসামা, সহকারীকে নিয়ে রওনা হলো জংলার দিকে। নিচু গলায় তাকে বলতে শুনলাম,

'মনিব ভাল শিকারী, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আলোয় যদি একটা বনমোরগও মারতে পারেন, নিজের নাম পাল্টে ফেলব আমি।'

কোয়াটারমেইনও সম্ভবত শুনতে পেয়েছেন কথাটা, কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। নির্বিকার রইলেন। বাতাস বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। খানসামা আর ওর সহকারী যখন জংলার ভিতরে লাঠি চালাতে শুরু করল, তখন রীতিমত শোঁ শোঁ হাওয়া বইছে।

জংলার ডান কোনায় অবস্থান নিয়েছি আমি, কোয়াটারমেইন দাঁড়িয়েছেন বাঁয়ে... আমার কাছ থেকে প্রায় চল্লিশ কদম দূরে। হঠাৎ একটা বুড়ো ফিজ্যান্ট বেরিয়ে এল আমার দিকে, পালক ফুলিয়ে রেখেছে আতঙ্কে। গুলি ছুঁড়লাম, কিন্তু প্রথম ব্যারেলের বুলেট লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ব্যারেলও খালি করলাম... এইবার পারলাম লাগাতে। মন খুশি হয়ে গেল। শটটা কঠিন ছিল। আড়চোখে কোয়াটারমেইনের দিকে তাকালাম, তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে মৌন প্রশংসা করলেন আমার শুটিঙের।

আত্মতুষ্টির সময় পেলাম না বেশি। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে লাঠি চালানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে শোনা গেল খানসামা আর ওর সহকারীর হৈচৈ।

'সামনে দিয়ে আসছে!'

'বাঁয়ে দিয়ে আসছে!'

'তৈরি থাকুন, সার!'

'ওই তো... উড়ে যাচ্ছে!'

উত্তেজনায় দম বন্ধ করে ফেললাম। মাথা তুলতেই চোখে

পড়ল একটা পাখি, বাতাসে ভর করে বিদ্যুৎবেগে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আলোকস্বল্পতার কারণে ওটার নড়াচড়া ঠিকমত ঠাহর করতে পারলাম না। গাছপালার উপর দিয়ে ডানা ঝাপটানোর আবছা চিহ্ন দেখছি, সেটাই ভরসা। আন্দাজের উপর টিপে দিলাম ট্রিগার। পাখিটার ডানায় একটু কাঁপুনি উঠল, তবে গায়ে লাগল না বুলেট। তাড়াহুড়ো করে আবার গুলি চালালাম, লাভ হলো না। আমাকে পেরিয়ে বামদিকে উড়ে গেল ওটা।

'মি. কোয়াটারমেইন!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'আপনার দিকে যাচ্ছে পাখিটা।'

আড়াল থেকে মাথা বের করে উঁকি দিলাম, কোয়াটারমেইন ওটাকে ঘায়েল করতে পারেন কি না, দেখার ইচ্ছে। মনে মনে অবশ্য ধরে রেখেছি, ব্যর্থ হবেন তিনি। যত দক্ষ শিকারীই হোন, এই প্রায়ান্ধকার পরিবেশে উড়ন্ত একটা পাখির গায়ে গুলি লাগানো অসম্ভব কাজ।

রাইফেলটা কাঁধে ঠেকিয়ে একটু বাঁকা হতে দেখলাম কোয়াটারমেইনকে। দু-দু'টো শিকার তাঁর দৃষ্টিসীমায়—আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া পাখিটা, আর ঝোপ ভেঙে তাঁর দিকে ছুটে আসা আরও একটা।

প্রায় একই সঙ্গে চেঁচাল খানসামা, 'আরেকটা উড়ে যাচ্ছে, সার!'

জংলার উপর দিয়ে তৃতীয় একটা পাখিকে ডানা ঝাপটাতে দেখতে পেলাম আমি। এরপর যা ঘটল, তাকে কেবল জাদুর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এমন চমৎকার শুটিং আমি জীবনে কখনও দেখিনি। প্রথম পাখিটা নিচু হয়ে উড়ছিল; বড়

একটা ঝোপের দিকে ছুটেছে, মাত্র দশ গজ দূরে ওটা, ঢুকে পড়তে পারলে বেঁচে যাবে। ওটার দিকেই আগে গুলি ছুঁড়লেন কোয়াটারমেইন। বাজের মত দৃষ্টি না থাকলে দুরূহ ওই শট নিতে পারবে না কেউ। অথচ নিলেন তিনি, খতমও করলেন পাখিটাকে। ফলাফল দেখার অপেক্ষা করলেন না, পরমুহূর্তে ঝট্ করে বন্দুকের নল ঘোরালেন, পঁয়তাল্লিশ গজ দূর থেকে ঘায়েল করলেন দ্বিতীয় পাখিটাকে। ওখানেই শেষ নয়। তৃতীয়টার পিছনে লাগলেন এরপর। মাথার প্রায় উপরে চলে এসেছে ওটা, একশো ফুট উচ্চতায় উড়ে যাচ্ছে। রাইফেল প্রায় খাড়া করে ফেললেন কোয়াটারমেইন। চোখের পলকে ঘটে গেল অনেককিছু। এক নজরে শিকারের অবস্থান দেখে নিলেন তিনি, বায়ুপ্রবাহের মাঝে কীভাবে গুলি ছুঁড়বেন, হিসেব করে ফেললেন; একইসঙ্গে ডান ব্যারেলের খালি কার্তুজটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা ভরে নিলেন। ততক্ষণে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেছে পাখিটা। আঠার মত ওটার পিছু পিছু রাইফেলের নল ঘোরালেন কোয়াটারমেইন, একটা চোখ বন্ধ করে টিপে দিলেন ট্রিগার।

বজ্রপাতের মত আওয়াজ হলো। পাখিটার পালক আর রক্ত ছিটকাতে দেখলাম। বুলেটের ধাক্কায় কিছুদূর চলে গেল ওটা, তারপর ভারী পাথরের মত আছড়ে পড়ল শ'খানেক গজ দূরে।

'চমৎকার শুটিং!' ছুটে গিয়ে অভিনন্দন জানালাম। 'মি. কোয়াটারমেইন, সবসময় এভাবেই শুটিং করেন নাকি আপনি?'

মৃদু হাসি ফুটল দুর্ধর্ষ শিকারীর মুখে। বললেন, 'সত্যি বলতে কী, শেষবার যখন এত দ্রুত তিনটে গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল, তখন পাখি না, আর বড় শিকার অপেক্ষা করছিল আমার সামনে। হাতি... পাগলা হাতি! তিন গুলিতে তিনটেকেই

খতম করেছিলাম, তবে ব্যাপারটা অন্যরকমও হতে পারত। আরেকটু হলে ওরা আমাকেই খতম করে দিচ্ছিল।'

কৌতূহল অনুভব করলাম ঘটনাটা জানার জন্য, কিন্তু সুযোগ পেলাম না। জংলা থেকে বেরিয়ে এসেছে খানসামা। কাছে এসে মনিবকে জিজ্ঞেস করল, 'একটাও কি শিকার করতে পেরেছেন, সার?'

গলার স্বরে বোঝা গেল, ইতিবাচক জবাব আশা করছে না।

'পেরেছি, জেফরিজ,' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলেন কোয়াটারমেইন। 'ওই যে, ঝোপের কাছে একটাকে পাবে। আরেকটা পড়েছে ওদিকে... পঞ্চাশ গজ দূরে।'

বিস্মিত হয়ে হাঁটা শুরু করল খানসামা, তাকে পিছন থেকে ডেকে ফেরালেন তিনি।

'জেফরিজ, দাঁড়াও। মাঠেও যেতে হবে তোমাকে। ওই যে, একটা পাথর দেখতে পাচ্ছ? একশো গজ দূরে... ওটার পাশে আরও একটা পাখিকে পড়ে থাকতে দেখবে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল খানসামার। কিছু বলতে চাইল, কিন্তু তোতলানো ছাড়া শব্দ বেরুল না মুখ দিয়ে। হতভম্ব ভঙ্গিতে উল্টো ঘুরল সে। চলে গেল পাখিগুলো আনতে।

হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরলাম আমরা।

যথাসময়ে ডিনারের জন্য এসে গেলেন স্যার হেনরি কার্টিস আর ক্যাপ্টেন গুড। দ্বিতীয়জন বেশ সাজ-পোশাক পরে এসেছেন। আঁটো একটা সুট পরেছেন, কারুকাজ-করা... অমন সুট আগে কোনোদিন দেখিনি আমি। ওয়েস্টকোটে গোলাপি প্রবালের পাঁচটা বোতামও লক্ষ করেছি।

জম্পেশ খাওয়াদাওয়া হলো। হালকা মেজাজে আছেন অ্যালান কোয়াটারমেইন, রসিক মানুষ তিনি, খুব মজা করে জেফরিজকে বোকা বানানোর গল্প শোনালেন সবাইকে। আজই প্রথম নয়, আগেও নাকি এমনটা ঘটেছে অনেকবার। ক্যাপ্টেন গুডের মুখেও শুনলাম শিকার-বিষয়ক বিভিন্ন অভিজ্ঞতার গল্প। এর মধ্যে একটা হলো কাশ্মীরে পাহাড়ি ছাগল শিকারের কাহিনি। টানা চারদিন নাকি ওগুলোকে ধাওয়া করেছিলেন তিনি। পঞ্চম সকালে ছাগলের পালের নাগালে পৌঁছান ভদ্রলোক। বুড়ো এক সর্দার ছিল ওতে, বাঁকানো শিংগুলো এত বড় আর মোটা যে, ক্যাপ্টেন বাড়িয়ে বলছেন কি না, সন্দেহ জাগল মনে। পালে আরও ছিল পাঁচ-ছ'টা মাদি ছাগল।

পাথরসারির আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে ওগুলোর দুইশ' গজের মধ্যে যান ক্যাপ্টেন গুড, তারপর রাইফেল তাক করেন বুড়ো সর্দারের দিকে। এরপরই ঘটল আরেক ঘটনা। কাছের পাহাড়সারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন আদিবাসী। ঘুরতে বেরিয়েছে ওরা। মানুষগুলোকে দেখেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল পাহাড়ি ছাগলের পাল। মাদি ছাগলগুলো ছুটে পালিয়ে গেল বড় এক পাথরের ওপাশে, ক্যাপ্টেন গুডের নাগালের বাইরে। কিন্তু বুড়ো সর্দার ধরল অন্য... কঠিন এক পথ। বিশাল এক পাহাড়ি ফাটল ছিল কাছে, পুরো ত্রিশ ফুট চওড়া। সেদিকে ছুটে গেল ওটা। ফাটলের কিনারে পৌঁছে লাফ দিল, অন্যপাশে চলে যাবার চেষ্টা।

শূন্যে থাকতেই প্রাণীটাকে গুলি করলেন গুড, ওখানেই খতম করলেন। বাতাসে পাক খেল ছাগলের দেহ, পড়ে যেতে শুরু করল। ফাটলের ভিতরে পড়ল না ওটা, পড়ল না ফাটলের

ওপাশেও। বরং পাক খেয়ে ফাটলের দেয়ালে আছড়ে পড়ল, বড় বড় শিংগুলো গেঁথে গেল তাতে, পুরো ছাগলটাই দর্শনীয় এক বস্তুর মত ঝুলতে থাকল ওখানে। পরে গুড অনেক কষ্টে একটা দড়ির ফাঁসের সাহায্যে উঠিয়ে আনেন ওটাকে।

অদ্ভুত এই শিকার কাহিনি শুনে হেসে উঠলাম সবাই। বলা বাহুল্য, এমন আজগুবি গল্প বিশ্বাস না হবারই কথা।

একটু যেন মনঃক্ষুণ্ণ হলেন ক্যাপ্টেন গুড। গোমড়ামুখে বললেন, 'বেশ, আপনারা যদি আমার গল্প বিশ্বাস না করেন, তা হলে নিজেরাই একটা বলুন। হোক তা সত্য কিংবা বানানো, কথা দিচ্ছি, আমি অন্তত মশকরা করব না কারও গল্প নিয়ে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

মি. কোয়াটারমেইনের দিকে তাকালাম আমি। বললাম, 'সার, বলুন কিছু একটা। ক্যাপ্টেন গুডের কাছে হেরে যাবেন নাকি? বিকেলেই তো তিনটে হাতি মারার কথা বলছিলেন; ওই গল্পই নাহয় শোনান আমাদেরকে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন কোয়াটারমেইন। তারপর বললেন, 'কী আর বলব, গুডের গল্পকে টেক্কা দেবার ক্ষমতা নেই আমার। আর হ্যাঁ, ওটাকে পুরোপুরি অবিশ্বাসও করছি না। কার্টিস, মনে আছে আপনার, মার্টিনি রাইফেল দিয়ে তিনশো গজ দূর থেকে গুডকে জিরাফ শিকার করতে দেখেছি আমরা। ওর পক্ষে সবই সম্ভব।'

কোয়াটারমেইনের কথা শুনে একটু উজ্জ্বল হলো ক্যাপ্টেন গুডের দৃষ্টি।

হাসলেন কোয়াটারমেইন। উঠে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরালেন, তারপর পায়চারি করতে করতে বললেন, 'যা হোক, আপনারা

যদি চান, তা হলে আরেকটা গল্প শোনাতে পারি আমি। সেদিন তিন সিংহের গল্প শুনিয়েছি আপনাদের—কীভাবে সিংহীর হাতে জিম-জিমের মৃত্যু হলো, তারপর ওকে রুটির বস্তায় ভরে কীভাবে কবর দিলাম... তা তো জেনেছেন ইতিমধ্যে।* এখন যে গল্প শোনাব, তা ঘটেছিল ওই ঘটনার পরে...'

শুরু হলো অ্যালান কোয়াটারমেইনের কাহিনি। পাঠকদের সুবিধার্থে তাঁর জবানিতেই ওটা তুলে দিচ্ছি নীচে।

সেই অভিজ্ঞতার পর বেশ নাড়া খেলাম। ভাবলাম অন্তত ক'টা দিনের জন্য থিতু হব। তাই পরিচিত এক লোকের সঙ্গে ব্যবসায় নেমে পড়লাম। ঠিক করলাম প্রিটোরিয়ায় একটা দোকান দেব, স্রেফ নগদে বেচাকেনা হবে ওখানে, বাকির কারবার থাকবে না। আমাদের চুক্তিটা এমনভাবে হয়েছিল, যাতে আমি পুঁজির জোগান দেব, আর ও দেবে অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের এই পার্টনারশিপ বেশিদিন টিকল না। বোয়ার জাতের মাঝখানে ব্যবসা করতে গেলে যা হয় আর কী... নগদ দাম মেটাতে চাইল না ওদের কেউই। ফলে চারমাসের ব্যবসাশেষে দেখা গেল, আমার হয়েছে অভিজ্ঞতা, আর আমার পার্টনারের হয়েছে পুঁজি... মানে টাকা।

এই ঘটনার পরে টের পেলাম, ব্যবসা-বাণিজ্য আসলে আমার জন্য নয়। খামোকা ওসবের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গিয়ে মস্ত ভুল করেছি। হাতে চারশো পাউন্ড অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে আমার ছেলে হ্যারিকে পাঠিয়ে দিলাম নেটালের এক বোর্ডিং

---

* হ্যাগার্ডের *আ টেল অভ থ্রি লায়ন্স* দ্রষ্টব্য।

স্কুলে; আর প্রয়োজনীয় রসদপত্র কিনে আমি নিজে বেরিয়ে পড়লাম নতুন অভিযানে।

এই দফা বহুদূর যাব বলে ঠিক করেছি, আগে যেখানে কোনোদিন যাইনি। অল্প কিছু ভাড়ার বিনিময়ে এক সওদাগরী জাহাজে উঠে পড়লাম, ডারবান থেকে চলে গেলাম ডেলাগোয়া বে-তে। ওখানে পৌঁছে বিশজন কুলি জোগাড় করলাম, স্থলপথে রওনা হয়ে গেলাম অজানার উদ্দেশে। ইচ্ছে, উত্তরদিকে যাব... লিমপোপো অভিমুখে। উপকূল থেকে দেড়শো মাইল সমান্তরালে একটা পথ ধরলাম, এগিয়ে চললাম সামনে।

যাত্রার প্রথম বিশদিন খুব কষ্টে কাটল। কুলিদের অনেকেই আক্রান্ত হলো জ্বরে। আমার অবশ্য কিছু হয়নি; কেন যেন জ্বর-টর হয় না কখনও আমার। খাবারদাবারেও বেশ অসুবিধে হলো, মাংস পাওয়াই গেল না বলতে গেলে। যদিও জনবিরল এলাকার মাঝ দিয়ে এগোচ্ছি, কিন্তু শিকার পাচ্ছি না একদম। বড় কোনও পশু দেখতে পেলাম না ধারেকাছে। সত্যি বলতে কী, প্রথম কিছুদিনে জলহরিণ ছাড়া আর কিছু মারতে পেরেছি বলে মনে পড়ে না। তাতেও লাভ কী, আপনারা হয়তো জানেন, জলহরিণের মাংস মোটেই সুস্বাদু নয়।

যা হোক, বিশদিন কেটে যাবার পর বড় এক নদীর তীরে পৌঁছুলাম আমরা—*গনুরু* ওটার নাম। ওটা পেরিয়ে এলাম, তারপর এগোতে থাকলাম আকাশছোঁয়া একসারি পর্বতমালা লক্ষ্য করে। দূর থেকে পাহাড়গুলোর নীলচে চূড়া দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, যেন স্বর্গকে স্পর্শ করছে। ওই পর্বতমালা, আমার বিশ্বাস, নেটাল উপকূলের ড্রেকেন্সবার্গ মাউন্টেইন রেঞ্জের বর্ধিত অংশ। মূল রেঞ্জ থেকে বিশাল এক বাহু পঞ্চাশ মাইল

পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে উপকূলের দিকে... থেমে গেছে নিঃসঙ্গ এক উঁচু পাহাড়ের কাছে গিয়ে।

পর্বতমালার এই বাহুতে দুটো আদিবাসী গোত্রের খোঁজ পাই আমি, সর্দারদের নাম নালা আর ওয়াম্বে। উত্তরের এলাকা ওয়াম্বের দখলে, দক্ষিণ অংশটা নালার। হিংস্র স্বভাবের একদল জুলুকে শাসন করে নালা... ওদেরকে বলা হয় বুটিয়ানা; ওয়াম্বের গোত্র অনেক বড়, ওটার নাম মাটুকু। এদের মাঝে বাণ্টু জাতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। এই যেমন, ওদের কুঁড়েঘরে দরজা আর বারান্দা আছে; লোমঅলা চামড়া ব্যবহার করে না, পরিষ্কার করে নেয়; তা ছাড়া স্থানীয় *মুচা*-র বদলে কৌপিন পরে। যতদূর বুঝলাম, বুটিয়ানারা মাটুকু জাতির অধীনে আছে। বিশ বছর আগে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হয়েছে। আমরা যখন গেলাম, তখন অবশ্য অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে ওরা, কিন্তু উন্নতির গতি বড়ই মন্থর। বোঝা গেল, মাটুকুদের মোটেই পছন্দ করে না বুটিয়ানারা।

যাবার পথে শুনেছিলাম, ওয়াম্বের এলাকার সীমানায়, পাহাড়ের ঢাল আর গোড়ার ঘন জঙ্গলে প্রচুর হাতি পাওয়া যায়। ওয়াম্বের ব্যাপারেও শুনেছি অনেককিছু, একটাও ভাল কথা নয়। জেনেছি, পাহাড়ের ধারে একটা বিশাল বাড়িতে থাকে সে, ওটা নাকি দুর্গের মত সুরক্ষিত। আফ্রিকার সবচেয়ে নিষ্ঠুর সর্দার হিসেবে কুখ্যাতি আছে লোকটার—সাত বছর আগে একদল ইংরেজ গিয়েছিল তার এলাকায় হাতি-শিকার করতে, ওদেরকে নাকি আটক করে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছিল ওয়াম্বে। আমার এক পুরনো বন্ধু ছিল ওদের গাইড হিসেবে, নাম জন এভারি; ওর

মৃত্যুর খবরে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

যত কিছুই হোক, ওয়াম্বের ভয়ে পিছু হটবার বান্দা নই আমি; হাতি শিকার করবই—এমন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল মনে। স্থানীয় আদিবাসীদেরকে কোনোকালে ভয় পাইনি আমি, নতুন করে তা শুরু করার ইচ্ছে নেই। আমার একগুঁয়েমির কথা আপনারা হয়তো জানেন। তাই ঠিক করেছিলাম, কপালে যদি জন এভারির ভাগ্য লেখা থাকে, তা বরণ করে নেব। মরণ ঠেকানোর তো উপায় নেই কোনও। কাজেই যতক্ষণ পারি, মনের আশ মিটিয়ে হাতি-শিকার করি না কেন!

পর্বতমালার দেখা পাবার তিনদিন পরে আমরা ওর পাদদেশে পৌঁছুলাম। তখনও নদীর ধারা অনুসরণ করে এগোচ্ছি। অদ্ভুত এক দৃশ্য ওটা—ঘন জঙ্গলকে গভীর ক্ষতের মত চিরে নেমে এসেছে ওটা পাহাড়ের গা বেয়ে। খুব শীঘ্রি আমরা ওয়াম্বের এলাকায় পা রাখলাম। কুলিদের সঙ্গে এ-নিয়ে বেশ এক চোট হয়ে গেল আমার। মাটুকুদের সীমানায় পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ওরা। মালপত্র নামিয়ে রেখে বসে পড়ল মাটিতে, আর এক পা-ও এগোতে রাজি নয়। আমিও বসলাম ওদের সঙ্গে, যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম অশিক্ষিত লোকগুলোকে—ওয়াম্বেকে ভয় পাবার কিছু নেই। আর মৃত্যু... সে তো অবধারিত এক ভাগ্য সবারই জন্য। যেখানে যার মৃত্যু লেখা আছে, সেখানেই হবে। তাকে এড়াবার কোনও উপায় নেই। তা হলে কেন কাপুরুষের মত পিছিয়ে যাওয়া!

বলা বাহুল্য, আমার যুক্তির কোনও ইতিবাচক প্রভাব পড়ল না ওদের উপর। বরং একযোগে বলল, 'দেবতাদের দয়ায় এখনও আস্ত আছি আমরা, কিন্তু বিনা-অনুমতিতে যদি ওয়াম্বের

মাটিতে পা রাখি, তা হলে ঝরে পড়া পাতার দশা হবে সবার। নির্ঘাত মারা যাব। আপনার ভাষায় ওটা আমাদের ভাগ্যে লেখা থাকতে পারে; তাই বলে জেনেশুনে অমন ভাগ্যকে বরণ করে নেবার ইচ্ছে নেই আমাদের। অন্তত এটুকু তো জানি, ওয়াম্বের দেশে না ঢুকলে অমন ভাগ্যকে এড়ানো যায়।'

কুলি-সর্দারের নাম গোবো, ওর দিকে তাকালাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে তোমরা কী করতে চাও?'

'আমরা উপকূলে ফিরে যেতে চাই, মাকুমাজান,' রুক্ষ গলায় বলল গোবো।

'তা-ই?' বাঁকা সুরে বললাম আমি। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে ওদের কথাবার্তা শুনে। 'শোনো গোবো, একটা নিশ্চয়তা দিতে পারি—তুমি... এবং সঙ্গের আরও দু'চারজন কোনোদিনই পৌঁছুতে পারবে না উপকূলে। কেন, জানো?' অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে একটা রিপিটিং রাইফেল তুলে নিলাম হাতে, একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলাম। 'নাশতা সেরেছি একটু আগে, পেটে খিদে নেই। তাই সারাদিন বসে থাকতে পারব এখানে। তোমরা যদি একচুল নড়ো... এক কদমও বাড়াও চলে যাবার জন্য, তা হলে গুলি চালাব আমি। জানো তো, আমার নিশানা কখনও ব্যর্থ হয় না।'

হাতে ধরা বর্শার গায়ে আঙুল বোলাল গোবো। কপাল ভাল, আমার সবক'টা রাইফেল গাছের গোড়ায় জড়ো করে রাখা হয়েছে। ওদিকে তাকাল চকিতের জন্য, তারপর উল্টো ঘুরল ধীরে ধীরে। মৃদু গুঞ্জন উঠল বাকি কুলিদের মাঝে, সবার চোখ সেঁটে রয়েছে আমাদের দু'জনের উপর।

উঠে দাঁড়িয়ে গোবোর দিকে রাইফেল তাক করলাম আমি।

খেয়াল করলাম, চেহারায় দুঃসাহস ফুটিয়ে রাখলেও ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে আছে লোকটা। উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল বটে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে আমাকে।

ওকে বিশ গজ যেতে দিলাম আমি, তারপরই জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'গোবো, ফিরে এসো। নইলে গুলি চালাতে বাধ্য হব আমি।'

বলতে দ্বিধা নেই, খুবই ভয়ঙ্কর একটা হুমকি দিচ্ছি আমি। সত্যিকার অর্থে গোবো বা অন্য কাউকে গুলি করার কোনও অধিকার নেই আমার, বিশেষ করে ওরা যেহেতু প্রাণ বাঁচানোর জন্য পিছু হটতে চাইছে। কাউকে খুন করার ইচ্ছেও পোষণ করছি না: কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি—পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কঠোর না হয়ে উপায় নেই কোনও। শেষ পর্যন্ত হয়তো গুলি চালাব না, তবে সেটা ওদেরকে বুঝতে দেয়া যাবে না।

তাই হিংস্র সিংহের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, নিষ্কম্প হাতে রাইফেল তাক করে রেখেছি গোবোর পিঠে। গুলি করতে প্রস্তুত। কাজ হলো কৌশলটাতে। আমার হাবভাব দেখে মনোবল হারিয়ে ফেলল কুলি-সর্দার, পরাজয় স্বীকার করে নিল।

'গুলি করবেন না, মালিক!' আচমকা দু'হাত তুলে উল্টো ঘুরল সে। 'আমি যাব আপনার সঙ্গে।'

'জানতাম এ-কথা বলবে,' শান্ত কণ্ঠে বললাম ওকে। 'কারণ মানুষের মরণ শুধু ওয়াম্বের রাজত্বে নয়, বাইরেও ঘোরাফেরা করে।'

এরপর আর কোনও ঝামেলা পোহাতে হলো না। গোবো হলো কুলিদের নাটের গুরু, সে হার মানায় বাকিরাও হার মানতে বাধ্য হলো। শৃঙ্খলা ফিরে এল দলের মাঝে, মাটুকুদের সীমানা

অতিক্রম করলাম আমরা। পরদিন থেকে মহানন্দে নেমে পড়লাম হাতি শিকারে।

দুই

এক সকালের শিকার

উঁচু যে পাহাড়টার কথা বলেছি, সেটার পাঁচ-ছ'মাইলের মধ্যে চলে গেলাম আমরা। অদ্ভুত সুন্দর এক জায়গার দেখা পেলাম ওখানে—কুকুয়ানাল্যাণ্ডের বাইরে আফ্রিকার অমন প্রকৃতি আগে কখনও দেখিনি।

পর্বতমালার বাহু ওখান দিয়ে প্রায় সমান্তরালভাবে চলে গেছে বিশাল মাউন্টেইন রেঞ্জের দিকে। উত্তর আর দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায়, সবখানে মেঘে-ঢাকা উঁচু-নিচু পর্বতশৃঙ্গ। বিশাল... অপূর্ব এক বাঁক সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়শ্রেণির এলোমেলো অবস্থানের কারণে। পাঁচ মাইল থেকে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত তার পরিধি। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই সমতলের মাঝখান চিরে চলে গেছে একটা নদী, সূর্যের আলো চিকচিক করছে পানিতে। নদীর অপর পাশে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠেছে জমি, পাহাড়ি ঢালে পরিণত হয়ে মিশে গেছে পর্বতমালার সঙ্গে। ঝোপঝাড় আর নানা রকম গাছপালায় ঢাকা সে-জমি। সবুজের সমারোহ সবখানে। ঘাসে

ঢাকা তৃণভূমিও আছে এখানে-সেখানে, আছে ছোটবড় নানা আকারের বৃক্ষরাজি। দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট টিলা—কোনোটা মাটি-পাথরের, কোনোটা আবার নিরেট গ্র্যানিটের। দৃষ্টিভ্রম জাগে, মনে হয় বুঝি মানুষের হাতে তৈরি হয়েছে ওগুলো—বিকট কোনও সমাধিফলকের মত মাথা তুলে রেখেছে হারিয়ে যাওয়া অতীতের সাক্ষী হয়ে। সুন্দর এই সমভূমির সীমানায় রয়েছে নিঃসঙ্গ সেই পাহাড়, ওটার পাশ দিয়ে পর্বতমালার বাহু চলে গেছে উপকূলের দিকে... কতদূর পর্যন্ত, তা কেউ জানে না। স্থানীয় লোকজনের কাছে শুনেছিলাম, ওটা ধরে টানা আটদিন এগোলে অভিশপ্ত এক জায়গায় পৌঁছুনো যায়; আজ পর্যন্ত ওখান থেকে ফিরে আসেনি কেউ।

নদীর অন্যপ্রান্তের কথা বলি এবার। ওই অংশটা জলাভূমিতে ঢাকা। এরপর রয়েছে ঘাসে ঢাকা সুন্দর অনেকখানি জায়গা, ওটা মিশেছে জঙ্গলের সীমানায় গিয়ে। সমতল থেকে প্রায় এক হাজার ফুট উঁচুতে শুরু হয়েছে এই জঙ্গল, প্রায় চূড়ার কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত। বড় বড় প্রচুর গাছ আছে ওতে, বেশিরভাগই ইয়েলোউড প্রজাতির। কোনও কোনোটা এত লম্বা যে, মগডালে বসে থাকা পাখিকে শটগানের রেঞ্জের মধ্যেই পাওয়া যাবে না। আরেকটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো প্রায় প্রতিটা গাছই ঢাকা পড়ে আছে *অরচিলা* নামের শ্যাওলায়। এই শ্যাওলা থেকে স্থানীয় আদিবাসীরা এক ধরনের গাঢ় বেগুনি রঙ তৈরি করে। নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র, আর পোশাক-আশাকে মাখায় সে-রঙ। সে-এক অদ্ভুত দৃশ্য—বিশাল বিশাল মহীরুহ ঢাকা পড়ে আছে শ্যাওলার মত অগণ্য পরজীবীতে। গাছের চেহারাই পাল্টে গেছে তাতে।

যা হোক, গোবোর সঙ্গে যেদিন কথা কাটাকাটি হলো, সে-রাতে ওই জঙ্গলের ধারে পৌঁছে ক্যাম্প করলাম আমরা। পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়লাম শিকারের আশায়। শুকনো খাবার-দাবার ছিল সঙ্গে, কিন্তু মাংস ছিল না; তাই সবার আগে একটা বুনো মোষ শিকার করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। জঙ্গল আর তৃণভূমিতে অভাব নেই ওগুলোর।

ক্যাম্প থেকে আধমাইল যেতেই পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। বুঝলাম, ওখান দিয়ে বুনো মোষের একটা বিরাট পাল নিয়মিত চলাচল করে নীচের ঘেসো জমিতে যাবার জন্য। ট্রেইলটা ধরে এগোতে শুরু করলাম। বাতাস সামনে থেকে বইছে, কাজেই আমার গায়ের গন্ধ পশুগুলোর নাকে পৌঁছুনোর ভয় নেই। দ্রুত পা চালালাম।

মাইলখানেক যেতে ঘন হতে শুরু করল জঙ্গল। ট্রেইলের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম, শিকারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আরও দুইশ' গজের মত এগোলে ঝোপঝাড় এত পুরু হয়ে উঠল যে, মোষের পালের তৈরি করা পথটা না থাকলে সামনে বাড়াই মুশকিল হয়ে যেত।

আমার হাতে এক্সপ্রেস রাইফেল, গোবো আরেকটা আট বোর রাইফেল নিয়ে এগোচ্ছে। সঙ্গে আরও দু'জন কুলিকে নিয়েছি, আমাদেরকে অনুসরণ করছে। হঠাৎ বেঁকে বসল ওরা, আর এগোতে রাজি হলো না। যুক্তি দেখাল, বিপদে পড়লে এই ঘন জঙ্গল ভেদ করে পালাবার উপায় নেই। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ওদেরকে বললাম, ভয় পেলে ফিরে যেতে পারে; তবে গোবোকে নিয়ে আমি এগোব-ই। একটু যেন লজ্জা পেল ওরা, মাথা নেড়ে জানাল, ভীতু নয় ওদের কেউই, আমাদের সঙ্গে থাকবে।

আরও পঞ্চাশ গজ এগোলাম। বনের ভিতর একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলাম। আড়াল থেকে নজর বোলালাম ওখানে, কিন্তু একটা মোষও চোখে পড়ল না। পায়ের ছাপ আর বিষ্ঠার দাগ থেকে বোঝা গেল, এখানে পৌঁছে পালটা ছড়িয়ে পড়েছে। একেকটা মোষ চলে গেছে একেক দিকে। একসারি ট্র্যাক বেছে নিয়ে নতুন করে পিছু নিলাম। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে আবার ঢুকে পড়লাম গাছপালার ভিতরে।

ষাট গজের মত যেতেই থমকে দাঁড়ালাম। টের পেলাম, পশুগুলোর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছি। যদিও ঘন ঝোপঝাড়ের কারণে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বাঁয়ে, কয়েক গজ দূর থেকে ভেসে এল গাছের গায়ে মোষের শিং ঘষার আওয়াজ, ডানদিকে শোনা গেল চাপা গরগর—সম্ভবত বুড়ো একটা ষাঁড় ওটা। দমবন্ধ হয়ে এল উত্তেজনায়। পা টিপে টিপে এগোলাম ওদিকে। খুবই সাবধানে, প্রতিবার পা ফেলার আগে দেখে নিচ্ছি, শুকনো ডালপালা পড়ে আছে কি না, থাকলে সরিয়ে দিচ্ছি। কিছুতেই শিকারকে সতর্ক হতে দেব না। আমার পিছু পিছু থাকল গোবো আর ওর দুই সঙ্গী—সবার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

হঠাৎ আমার পা স্পর্শ করল গোবো। ঘাড় ফেরাতেই ওকে বামদিক আঙুল তুলতে দেখলাম। মাথা উঁচু করে সাবধানে উঁকি দিলাম ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে। চোখে পড়ল মাংসল ঘাড়, মাথা আর চোখা দুটো শিং। বিশাল এক মদ্দা বুড়ো মোষ আমাদের কাছ থেকে বড়জোর পনেরো কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবোর কাছ থেকে আট বোরের রাইফেলটা নিয়ে মোষের ঘাড়ের কাছে লক্ষ্যস্থির করলাম। এক গুলিতে ওটার শিরদাঁড়া

ভেঙে দেবার ইচ্ছে। কিন্তু ট্রিগার চাপার আগেই নড়ে উঠল পশুটা। ক্লান্ত হয়ে গেছে বোধহয়, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ঝোপঝাড়ের মাঝে। অসহায় বোধ করলাম, এই পজিশন থেকে গুলি ছোঁড়া আর সম্ভব নয়। ঝোপের কারণে মোষের পুরো শরীর আমার দৃষ্টিসীমার আড়ালে পড়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেষ্টা নেয়া যায়, তবে তাতে সমস্যা আছে। নিশানা ঠিক করার আগেই আমাকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে, কিংবা খেপে গিয়ে হামলাও চালিয়ে বসতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

কিছুক্ষণ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলাম। শেষে ভাবলাম, অনন্তকাল বসে থাকবে না মোষটা, একসময় না একসময় ঠিকই উঠে দাঁড়াবে। তাই ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম। জুলুদের ভাষায় এ হলো *বসে থাকার লড়াই!* সঙ্গীদেরকে কথাটা জানিয়ে দিয়ে একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসলাম। বাতাস উল্টোদিক থেকে বইছে বলে, পাইপও ধরিয়ে ফেললাম। আয়েশ করে টান দিলাম তাতে। তামাকের গন্ধ পশুটার নাকে যাবার ভয় নেই।

ধীরে ধীরে পনেরো মিনিট... ত্রিশ... পঁয়তাল্লিশ মিনিট, মানে পৌনে এক ঘণ্টা কেটে গেল। অস্থিরতা ভর করল মনে। কাঁহাতক আর চুপচাপ বসে থাকা যায়? এ-যেন বিরক্তিকর কোনও অপেরা দেখার মত ব্যাপার। শুনতে পাচ্ছি, আমাদের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে মোষের পাল; ওগুলোর পিঠে আরাম করে বসে থাকা পাখির অবয়বও দেখছি কখনও কখনও, অথচ কিছু করতে পারছি না। বুড়ো মোষটারও কোনও সাড়াশব্দ নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে কি না কে জানে!

শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলব ভাবছি, তখনই মনোযোগ টুটে গেল অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুঃ। প্রথমে

ভাবলাম বুঝি কোনও মোষের জাবর কাটার শব্দ, কিন্তু পরক্ষণে বাতিল করে দিলাম সে-ধারণা। শব্দটা অনেক জোরে হচ্ছে। এত জোরে জাবর কাটে না কোনও মোষ। নড়ে উঠলাম, ঝোপঝাড়ের পাতা সরিয়ে উঁকি দিলাম শব্দের উৎসের দিকে।

ঠিকমত দেখতে পেলাম না কিছু। একবারের জন্য মনে হলো, পঞ্চাশ গজ দূরে ধূসর রঙের কী যেন একটা নড়ে উঠল, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলাম না। অদ্ভুত শব্দটা বেড়ে গেল আরও, তবে উপায়ান্তর না দেখে অগ্রাহ্য করলাম ওটাকে। মনোযোগ ফেরালাম আবার আমার বুড়ো মোষের দিকে।

হঠাৎ পরিস্থিতি বদলে গেল। খুব কাছ থেকে প্রচণ্ড এক ফোঁসফোঁসানি ভেসে এল... বড়জোর ত্রিশ-চল্লিশ দূর থেকে। পরমুহূর্তে মাটিতে দ্রুত পদধ্বনি শুনলাম, যেন ভারী কোনও ট্রেন ছুটে আসছে আমাদের দিকে।

ঝট্ করে ফিরলাম ওদিকে। ভাবলাম, 'সর্বনাশ! নিশ্চয়ই ওটা গণ্ডারের পায়ের আওয়াজ! আমাদের গন্ধ পেয়ে ছুটে আসছে!'

অনুমানটা ভুল হবার কোনও কারণ নেই। শিকারের সন্ধান পেলে গণ্ডার কী ধরনের শব্দ করে, তা সম্ভবত আপনারা সবাই জানেন।

যা হোক, প্রতিক্রিয়া দেখাবার সময় পেলাম না। চোখের পলকে কাছে চলে এল পায়ের আওয়াজ। তারপরেই আমাদের সামনে... আট গজ দূরের ঝোপঝাড় ভেঙে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। কী তার চেহারা, কী তার আক্রোশ... তা বলে বোঝাতে পারব না। বিশাল এক শিং তার নাকের ডগায়, চোখের তারায় পরিষ্কার খুনের নেশা! পাইপের গন্ধ পেয়েছে,

নাকি আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে, তা বলা মুশকিল। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, খেপে গেছে ভীষণ।

ঘটনার আকস্মিকতায় চলৎশক্তি হারালাম। উঠে দাঁড়াতে পারলাম না, রাইফেলটা পর্যন্ত পারলাম না উঁচু করতে। সময়ও নেই হাতে। শেষ মুহূর্তে বাঁচার তীব্র আকুতিতেই সম্ভবত গড়ান দিলাম একটা; যতটুকু পারলাম, সরে গেলাম গণ্ডারের পথ থেকে। আমার প্রায় শরীরের উপর দিয়ে ছুটে গেল প্রাণীটা। ওর গায়ের তীব্র বোটকা গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে, আজও সে-গন্ধ ভুলতে পারিনি। একটা খুরের আঘাতে প্যান্টের কিনার ছিঁড়ে উরুর ছাল-চামড়া উঠে গেল, তবে মারাত্মকভাবে আহত হলাম না।

আমার পিছনে ছিল কুলিরা। ওদের দিকে এবার ছুটে গেল গণ্ডার। শোয়া অবস্থা থেকে মাথা তুলে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালাম ওদের দিকে। প্রথমজন অনেকটা আমার ভঙ্গিতে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাল, দ্বিতীয়জনকে দেখলাম পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠে ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে দৌড় দিতে। তৃতীয়জন... কুলি-সর্দার গোবোর কপাল এতটা ভাল হলো না। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু তারপরে মূর্তির মত জমে গেল। মাথা নিচু করে ছুটে যাচ্ছিল গণ্ডারটা, ওর দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে ঢুকিয়ে দিল শিং, পায়ের স্পর্শ পেতেই এক ঝটকায় উপরে তুলল মাথা। বাতাসে উড়ে গেল গোবো, শূন্যে এক চক্কর খেল। পলকের জন্যে তার চেহারা দেখতে পেলাম—আতঙ্কে চোখদুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল বেচারার গলা চিরে। বাতাসে ডিগবাজি খেয়ে আবার পড়তে শুরু করল; তবে মাটিতে পড়ল না, পড়ল

গণ্ডারের পিঠে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে সেখান থেকে ছিটকে পড়ে গেল একপাশে। কপাল ভাল ওর, উল্টো ঘুরল না জানোয়ারটা। গতি অক্ষুণ্ন রেখে দুদ্দাড় করে চলে গেল ঝোপঝাড় ভেঙে।

সমস্যার তখনও শেষ হয়নি। গোলমালের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে বুড়ো মোষের। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ওটা। অবাক চোখে তাকাল আমাদের দিকে, আর তখুনি ওটার কাছে পৌঁছে গেল গণ্ডার। অবলা পশুটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই শিং দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত হানল। গড়ান খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল মোষ। ওটার উপর দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল গণ্ডার। হারিয়ে গেল ঘন জঙ্গলের ভিতরে।

পরমুহূর্তে পুরো জায়গাটা জ্যান্ত হয়ে উঠল আতঙ্কিত মোষের পালের চেঁচামেচিতে। খুরের শব্দ শুনলাম, পড়িমরি করে পালাতে শুরু করেছে ওগুলো স্ট্যামপিড হওয়া গরুর মত। আহত মোষটাও আর্তনাদ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাবার চেষ্টা করছে একদিকে। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলাম, একটাও যেন এদিকে না আসে। পাগলা মোষের সামনে পড়লে আর বাঁচার উপায় থাকবে না।

প্রার্থনায় সম্ভবত কাজ হলো, আমাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল না কোনও প্রাণী। ধীরে ধীরে খুরের আওয়াজ মিলিয়ে গেলে উঠে বসলাম। চারদিকে চোখ বোলালাম আমার সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা দেখার জন্যে। এক কুলিকে দেখলাম গাছের উপর উঠে গেছে; গোবেচারার কাছে গেলাম, ব্যথায় ককাচ্ছে সে, কিন্তু আঘাত গুরুতর মনে হলো না। কিন্তু তৃতীয় কুলি, যে ঝোপের মাঝ দিয়ে পালাতে চেয়েছিল, তার অবস্থা খারাপ।

কান্নার শব্দ পেয়ে কাছে গেলাম ওর। দেখলাম কাঁটাঝোপের বড় এক ডাল ওর কোমরের মাংস ভেদ করে আটকে গেছে। কাছেই আহত মোষটা রয়েছে। পালাতে পারেনি, সম্ভবত আমার কুলির উপরেই রাগ মেটাতে চাইছে। ঝোপের মাঝ দিয়ে শিং দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা হিংস্র ভঙ্গিতে।

নষ্ট করার মত সময় নেই। তাড়াতাড়ি আমার আট বোরের রাইফেলটা কুড়িয়ে নিলাম, ওটা কাঁধে ঠেকিয়ে নিশানা ঠিক করলাম মোষের ঘাড়ের উপর। চকিতের জন্য দেখতে পেলাম ওটার আঘাত—গণ্ডারের শিঙের গুঁতোয় পেটে বিরাট এক গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, অঝোর ধারায় বেরিয়ে আসছে রক্ত। আমি গুলি না করলেও রক্তপাতে খুব শীঘ্রি মারা যাবে ওটা।

ট্রিগার চাপলাম। রিকয়েলের কারণে অস্ত্রটা সামান্য ঝাঁকি খেল, তবে তা অনুভব করলাম না। শুধু দেখলাম, মোষটার ঘাড়ের কাছে রক্ত-মাংস ছিটকে উঠেছে। আর্তনাদ করে শুয়ে গেল পশুটা, মাটিতে পড়ে পা ছুঁড়ছে, ওটার শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে আট বোরের বুলেট। দাপাদাপি করতে করতে একসময় থেমে গেল দেহটা, জীবন বেরিয়ে গেছে।

গোবো ততক্ষণে ব্যথা সয়ে নিয়েছে। উঠে এসে সাহায্য করল আমাকে। দু'জনে মিলে আহত কুলিকে বের করে আনলাম ঝোপের ভিতর থেকে। ক্ষতস্থান বেঁধে দিলাম ছেঁড়া কাপড় দিয়ে। গলা ছেড়ে দেবতাকে ডাকতে শুরু করল লোকটা। বলল, ওপরঅলার সুনজর আছে তার উপর, তিনিই রক্ষা করেছেন, নইলে আজ নির্ঘাত মারা যেত।

এসবে তেমন বিশ্বাস নেই আমার। আট বোরের রাইফেলটা জীবন বাঁচিয়েছে ওর, অদৃশ্য কোনও শক্তি নয়। কৃতজ্ঞতা আমার

প্রতি প্রকাশ করলে বেশি খুশি হতাম। অবশ্য মুখে এসবের কিছু বললাম না। যে-যার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে থাকুক, তাতে আমার কী?

আহত কুলিকে পাঠিয়ে দিলাম ক্যাম্পে, সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে আসবে মোষটাকে কেটেকুটে নিয়ে যেতে। এরপর আমি ভাবতে বসলাম বুনো ওই গণ্ডারটাকে নিয়ে। ভিতরে ভিতরে একটু রাগ অনুভব করছি। আমার সুন্দর সকালটা মাটি করে দিয়েছে ও, এর প্রতিদান না দিলেই নয়। মনের মধ্যে কী চলছে, সেটা গোবোকে বুঝতে দিলাম না। দিলে সমস্যা হবে। গণ্ডারের গুঁতো খেয়ে ওর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মে গেছে, ওয়াম্বের রাজ্যে সত্যি সত্যি মৃত্যু ঘোরাফেরা করছে। তাই ওকে শুধু ইশারা দিলাম আমার পিছু পিছু আসতে। তারপর গণ্ডারের পায়ের ছাপ ধরে অনুসরণ শুরু করলাম আমি।

দেখা গেল, ঝোপঝাড় ভেঙে বনের ভিতরের ফাঁকা জায়গাটায় গেছে জানোয়ারটা। ওখানে পৌঁছে গতি একটু কমিয়েছে, আড়াআড়িভাবে পেরিয়েছে জায়গাটা, তারপর আবার ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। হাবভাবে মনে হলো, নদী আর বনের মাঝখানের উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে গেছে ওটা। মাইলখানেক যাবার পর আমরাও ওখানে বেরিয়ে এলাম।

দূরবীন বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম গোটা প্রান্তর। প্রায় এক মাইল সামনে আবছা একটা আকৃতির মত চোখে পড়ল, নিশ্চয়ই গণ্ডারটা। পোয়া মাইল এগোলাম ওদিকে, আবার দূরবীন লাগালাম চোখে। এবার বুঝতে পারলাম, গণ্ডার না, স্রেফ একটা পিঁপড়ের ঢিবি। তা হলে গণ্ডারটা গেল কোথায়? পায়ের ছাপ বলছে ধারেকাছেই আছে ওটা, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। শঙ্কা অনুভব করলাম, আমাদের পিছন দিক থেকে বাতাস

বইছে। গণ্ডার এক মাইল পর্যন্ত গন্ধ শুঁকতে পারে। কোন্ মুহূর্তে ফের হামলা চালিয়ে বসে, তার ঠিক নেই কোনও।

কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নই আমি। বাঁকা একটা পথ ধরে মাইলখানেক এগোলাম। পিঁপড়ের ঢিবিটার উল্টোপাশে পৌঁছে আবার জরিপ করলাম পুরো প্রান্তর। না, এখনও দেখা নেই আমার শিকারের। হতাশ হয়ে ফিরব বলে মনস্থির করলাম। পাহাড়ি কয়েকটা হরিণ দেখেছি, ওগুলোকেই শিকার করব ভেবে পা বাড়াতে যাব, এমন সময় লম্বা ঘাসের আড়ালে নড়ে উঠল কী যেন। চোখ কচলে ওদিকে তাকাতে দেখতে পেলাম গণ্ডারটাকে। পিঁপড়ের ঢিবি থেকে মোটামুটি তিনশো গজ দূরে শুয়ে ছিল ওটা, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে।

'সর্বনাশ!' ভাবলাম আমি। 'আবার হামলা করবে নাকি?'

আশঙ্কাটা অমূলক প্রমাণিত হলো। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আশপাশে তাকাল গণ্ডার, একটু পায়চারি করল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল ঘাসের আড়ালে।

একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। গণ্ডারের দৃষ্টিশক্তি খুব খারাপ... হয়তো সেটা জানেন আপনারা। কিন্তু ওর ঘ্রাণশক্তি অসম্ভব রকমের তীক্ষ্ণ। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা বলতে পারেন। চোখ যতটা খারাপ, প্রাণীটার নাক ততই ভাল। গণ্ডার নিজেও এ-ব্যাপারটা জানে। তাই চোখের বদলে নাকের উপরে বেশি নির্ভর করে। ঘুমানোর সময় মুখ রাখে বায়ুপ্রবাহের দিকে, যাতে শত্রু এলে আগেভাগে টের পায়; আক্রমণ করতে পারে, কিংবা সময় থাকতে পালিয়ে যেতে পারে। বাতাসের উল্টোদিক থেকে এগোলে কিছুটা সুবিধে পাওয়া যায়, যদি শব্দ না করতে পারেন, রীতিমত প্রাণীটার ঘাড়ে চড়ে বসতে পারবেন আপনি। কিন্তু

সেক্ষেত্রে ওর চোখে পড়ে যাবার একটা সম্ভাবনা থাকে।

এখন কথা হলো, কোন্দিক থেকে এগোব। শুধু সামনে বা পিছনের কথা ভাবলে চলবে না। দৃষ্টিসীমা, সেইসঙ্গে রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে পেতে হবে ওটাকে। এমন পজিশনে পৌঁছুতে হবে, যেখান দিকে সুবিধাজনক জায়গায় গুলি লাগাতে পারি ওটার। অনেকক্ষণ ভাবনাচিন্তার পর পাশ থেকে এগোব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম; এতে গণ্ডারটার কাঁধে গুলি করা যাবে বলে মনে হলো। ইশারায় গোবোকে বুঝিয়ে দিলাম কী করতে চাই। তারপর চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম। আমার ঠিক পিছনে রইল গোবো, আর শেষে দ্বিতীয় কুলি। একে অন্যকে প্রায় ছুঁয়ে রেখে সামনে বাড়লাম আমরা, এতে সারিবদ্ধ থাকা যাবে।

মোটামুটি তিনশো গজ পেরিয়ে এলাম নিরাপদে, এরপর দেখা দিল ঝামেলা। তৃণভোজী পশুরা প্রান্তরের এদিকটায় এমনভাবে ঘাস খেয়ে ফেলেছে যে আড়াল পাবার উপায় নেই। হামাগুড়ি দেওয়া গেল না আর, মাটিতে বুক মিশিয়ে দিয়ে সাপের মত শরীর ঘষে ঘষে এগোতে হলো। রাইফেলটা ঝামেলা করল সবচেয়ে বেশি। ওটাকে মাটিতে রেখে ঠেলতে হচ্ছে। সঙ্গে অশিক্ষিত লোকদুটো আরেক আপদ। ভীতুর ডিম এমনিতে, অথচ সতর্কতার কিছুই জানে না। মাটিতে বুক মিশিয়ে এগোতে কষ্ট হচ্ছে বলে বার বার শরীর উঁচু করে ফেলছে। বার বার পিছনে ফিরে চোখ রাঙাতে হলো।

শেষ রক্ষা আর হলো না। গণ্ডারের দুইশ' গজের মধ্যে পৌঁছুতেই ফাঁস হয়ে গেল আমাদের উপস্থিতি। গোবো আর ওর সঙ্গীর বেমক্কা নড়াচড়ার আওয়াজে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল

কতগুলো পাখি—ওগুলো গণ্ডারের পিঠে বসে চামড়ার ময়লা ঠোকরাচ্ছিল।

ঝট্ করে পিছনে তাকালাম। চাপা গলায় বললাম, 'খবরদার, নোড়ো না একচুল!'

পরমুহূর্তে সামনের ঘাসে আলোড়ন লক্ষ করলাম। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল গণ্ডারটা। পাখিগুলোর আচরণে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। কুঁৎকুঁতে চোখ মেলে তাকাচ্ছে এদিক-সেদিক। বিচলিত হয়ে পড়লেও ভয় পেলাম না। এতদূর থেকে আমাদেরকে দেখতে পাবে না প্রাণীটা। ওটার চোখের দৃষ্টি খুবই দুর্বল। বাতাসও বইছে না আমাদের দিক থেকে। মড়ার মত পড়ে থাকলেই হয়। তা-ই করলাম।

বেশ কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে রইল গণ্ডার। তাকাল চারপাশে, নাক টানল গন্ধ পাবার আশায়। কিন্তু সফল হলো না। শেষ পর্যন্ত বসে পড়তে দেখলাম ওটাকে। পাখিগুলোও ফিরে এসে আবার ওর পিঠে বসল।

শুয়ে পড়েছে গণ্ডার, কিন্তু বুঝতে পারছি—একটা চোখ খোলা রেখে ঘুমাচ্ছে এখন প্রাণীটা। আমাদেরকে দেখতে না পেলেও সতর্ক হয়ে গেছে নির্ঘাত। ওকে চমকে দিয়ে কার্যোদ্ধার করা সম্ভব নয় আর। বিকল্প ভাবতে হলো। চারপাশে নজর বুলিয়ে দমে গেলাম। নাহ্, আর একটা পথও নেই যেখান দিয়ে নতুন করে অগ্রসর হওয়া যায়। আড়াল বলতে রয়েছে কেবল পিঁপড়ের ঢিবিটা, কিন্তু ওটা বাতাসের উজানে। ওখানে আশ্রয় নিলে আমার গায়ের গন্ধ পেয়ে যাবে গণ্ডারটা। রেঞ্জও অনেক বেশি হয়ে যায়—প্রায় তিনশো গজ। এতদূর থেকে ওটাকে ঘায়েল করা খুবই কঠিন। তবে সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত

ঢিবির পিছনেই পজিশন নেব বলে ঠিক করলাম। ঝুঁকিপূর্ণ একটা কৌশল অবলম্বন করার ইচ্ছে। গণ্ডারের দিকে আমি না, গণ্ডারই গন্ধ পেয়ে আমার দিকে ছুটে আসুক। বন্দুকের নাগালের মধ্যে।

কী করতে চাই, তা খুলে বললাম আমার সঙ্গীদেরকে। শুনে আঁতকে উঠল ওরা। আশ্বাস দিলাম, ঝুঁকিটা আমি একাই নেব। ওদেরকে সঙ্গে যেতে হবে না। এ-কথা শুনে কিছুটা স্বস্তি পেল দু'জনে।

বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল গোবো—ওয়াম্বের দেশে ঘুরতে থাকা মৃত্যুর থাবা যেন না পড়ে আমার উপর। অন্যজনও সুর মেলাল তাতে। আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল ওরা, তারপর রওনা হয়ে গেল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

পকেটে আধ-ডজন বাড়তি কার্তুজ, আর আট বোরের রাইফেলটা নিয়ে আমিও পা বাড়ালাম। ঘুরপথে চলে এলাম পিঁপড়ের ঢিবির পিছনে। শুয়ে পড়লাম মাটিতে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। প্রখর সূর্যকিরণে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে পিঠ, সারা গা বেয়ে নামছে ঘামের ধারা। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। আমাকে পেরিয়ে সামনের দিকে চলে গেল বায়ুপ্রবাহ।

ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেলাম। ভাবলাম, মানুষের গন্ধ পশুপাখি এত প্রকটভাবে পায় কেন? সমস্যা কি আমাদের শরীরে, নাকি নিঃশ্বাসে? আজও জানতে পারিনি জবাবটা। যা হোক, সংবিৎ ফিরে পেলাম হঠাৎ। শিকারের মুহূর্তে মনোযোগ নষ্ট হতে দেয়া যাবে না, মনে করিয়ে দিলাম নিজেকে। রাইফেল বাগিয়ে ঢিবির পাশ দিয়ে উঁকি দিলাম সামনে।

যা ভেবেছিলাম... আমার গন্ধ পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল গণ্ডার।

ঘাসের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল তড়াক করে। অস্থিরতা লক্ষ করলাম হাবভাবে, কয়েক সেকেণ্ড পরেই এগোতে শুরু করল গন্ধের উৎস লক্ষ্য করে। প্রথমে ধীর কদমে, তারপর দৌড়ে। প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলাম আমি, নিয়ন্ত্রণহীন পাগলা রেল-ইঞ্জিনের মত ভয়ানক বেগে আমার দিকে ছুটে আসছে গণ্ডারটা। পায়ের আঘাতে কেঁপে উঠছে মাটি। চকিতের জন্য সন্দেহ জাগল, বোকামি করছি না তো! পাহাড়সম ওই মৃত্যুদূতের সামনে বুক পেতে দেয়া নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না?

মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি দূর করলাম চিন্তাটা। এখন আর পিছিয়ে আসার সময় নেই। নার্ভাসনেস কাটিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম, বন্দুকটা তাক করলাম সামনে। অপেক্ষা করছি প্রাণীটার দু'চোখ দেখতে পাবার জন্য, তার আগে গুলি করব না। সেটাই শিকারের নিয়ম। যেন অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হলো, তারপর কাছে এসে গেল গণ্ডার। চল্লিশ গজ দূর থেকে দু'পায়ের মাঝখানে, বুক বরাবর গুলি ছুঁড়লাম আমি।

ভারী বুলেটের ধাক্কায় ভীষণভাবে কেঁপে উঠল প্রাণীটা। মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। ভাবলাম সব শেষ, কিন্তু না, আমাকে অবাক করে দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল ওটা। নতুন করে ধেয়ে এল আমাকে লক্ষ্য করে। এবার আগের চেয়ে উন্মত্ত, মাথা নিচু করে রেখেছে শিঙের গুঁতোয় আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য।

অস্থির হলাম না, রাইফেল উঁচু করে অপেক্ষায় থাকলাম। বুকটা আরেকবার অরক্ষিত দেখালেই গুলি করব। কিন্তু গণ্ডারটা মাথা নিচু করে রাখায় সে-সুযোগ পেলাম না। দশ গজের মধ্যে

চলে এল ওটা। আর কোনও উপায় না দেখে ওটার মাথা বরাবর রাইফেলের বাম ব্যারেল খালি করলাম।

হা-হতোস্মি... খুলিতে ঢুকল না বুলেট, বাধা পেল গণ্ডারের শিঙে। গোড়া থেকে তিন ইঞ্চি উপরে শিংটাকে দু'টুকরো হয়ে যেতে দেখলাম, একই সঙ্গে বুলেটটাও ছিটকে গেল আরেকদিকে।

এরপর পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। রাইফেল খালি হয়ে গেছে, রিলোড করার সময় নেই। গণ্ডারটাও প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। উপস্থিতবুদ্ধি কাজে লাগালাম, তাড়াতাড়ি সরে গেলাম একপাশে। প্রাণীটা কাছে আসতেই প্রচণ্ড এক লাথি মারলাম পিঁপড়ের ঢিবিতে। আলগা মাটি উড়ল বাতাসে, ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে গেল গণ্ডার, আমাকে দেখতে না পেয়ে অন্যদিকে ছুটে চলে গেল।

সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলাম আমি। ঝেড়ে দৌড় লাগালাম। না দৌড়ে উপায় কী? খালি হাতে একটা গণ্ডারের সঙ্গে পেরে ওঠার তো কোনও উপায় নেই। কিন্তু ধুলো সরে গেলে ওটাও ধাওয়া করল আমাকে। বুঝতে পারলাম, কপালে খারাবি আছে। উন্মত্ত গণ্ডারকে দৌড়ে হারাতে পারব না কিছুতেই।

মাথা ঠাণ্ডা রাখলাম, ছোটার গতি কমিয়ে রাইফেলটার ব্যারেল খুললাম। খালি কার্তুজদুটো ফেলে দিয়ে নতুন দুটো ভরে নিলাম। ব্যারেল আবার সিধে করতেই পিছনে ফোঁসফোঁসানি শুনলাম। গণ্ডারটা আমার ছ'সাত গজের মধ্যে চলে এসেছে।

মরিয়া হয়ে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালাম। রাইফেলটা কোমরের কাছে রেখেই টিপে দিলাম ট্রিগার। কপাল ভাল, এই দফা মাথা

উঁচু করে রেখেছে প্রাণীটা। বুলেট গিয়ে লাগল বুকের প্রথম আঘাতের ঠিক তিন ইঞ্চি উপরে। চামড়া ভেদ করে সোজা ফুসফুসে সেঁধিয়ে গেল।

তাতে অবশ্য থামল না গণ্ডার, ছুটে চলল। বিদ্যুৎবেগে ডানদিকে ঝাঁপ দিয়ে ওটার পথ থেকে সরে গেলাম আমি। মাটিতে গড়ান দিয়ে আলতোভাবে তুলে আনলাম রাইফেল, প্রাণীটা আমাকে অতিক্রম করার সময় পাশ থেকে গুলি করলাম। এইবার পারলাম সঠিক জায়গায় লাগাতে। কাঁধের পাশ দিয়ে হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানল বুলেট।

ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গণ্ডার। মরণ-আর্তনাদ ছাড়ল। কাঁপতে শুরু করল দেহ। একটু পর নিস্তেজ হয়ে গেল। প্রাণহীন চোখদুটো ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

শব্দ করে নাক ঝাড়লাম আমি। গণ্ডারের লাশের পাশে গিয়ে ধপ করে বসে পড়লাম। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। কিন্তু আনন্দও অনুভব করছি। এক সকালের শিকারে ব্যক্তিগত অর্জন মন্দ হয়নি।

The Online Library of Bangla Books

তিন

প্রথম মোকাবেলা

দুপুর হয়ে গেছে তখন। মোষের শরীর থেকে প্রচুর মাংসও জোগাড় করা হয়েছে। কুলিদেরকে নিয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। মোষের মাংস আর সবজি রান্না করা হলো, সবাই মিলে পেট ভরে খেলাম সে-খাবার। এরপর দিবানিদ্রার জন্য শুয়ে পড়লাম তাঁবুতে গিয়ে।

ভাল ঘুম হচ্ছিল, স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু বেলা চারটার দিকে আমাকে ডেকে তুলল গোবো। জানাল, ওয়াম্বের গোত্রের এক লোক এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। হাত-মুখ ধুয়ে তাকে নিয়ে আসবার জন্য নির্দেশ দিলাম।

একটু পর হাজির হলো লোকটা। বৃদ্ধ, বেঁটে, চামড়ায় বলিরেখা। একটু বাচাল প্রকৃতির বলে মনে হলো। কোমরে চামড়ার নেংটি পরে আছে, খরগোশের চামড়া দিয়ে বানানো একটা শাল পেঁচিয়ে রেখেছে কাঁধের কাছে।

বসতে বললাম বুড়োকে। তারপর বকাঝকার বন্যা বইয়ে দিলাম। বললাম, 'এসবের মানে কী? আমাকে এভাবে বিরক্ত করছ কেন? তোমার মত তুচ্ছ আর নগণ্য একজনের সঙ্গে দেখা

করার জন্য বুঝি অসময়ে ঘুম ভাঙানো হয়েছে আমার? জানো, আমি কে? আমার ক্ষমতা আর পদমর্যাদা কতখানি?'

ইচ্ছাকৃতভাবে রুক্ষ আচরণ করছি, যাতে ওর মনে আমার ব্যাপারে সমীহ সৃষ্টি হয়। আফ্রিকার অশিক্ষিত, বর্বর লোকজনের মাঝে ভদ্রতা বা শিষ্টতার কোনও দাম নেই। যে যত উগ্র... যে যত বেয়াদব... তাকে ততই মহান আর ক্ষমতাবান বলে ভাবে ওরা। অদ্ভুত রীতি, কী আর বলব!

যা হোক, আমার বকাঝকা শুনে ভয়ে কুঁকড়ে গেল বুড়ো। মিনমিন করে ক্ষমা চাইল আমার ঘুম ভাঙানোর জন্য। বলল, ব্যাপারটা জরুরি, নইলে আমাকে বিরক্ত করত না এভাবে।

'আমাদের এলাকায় দুর্ধর্ষ, সুদর্শন এক সাদা শিকারীর আগমন ঘটেছে শুনেই ছুটে এসেছি,' তোয়াজ করার সুরে বলল সে। 'একমাত্র আপনিই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন, মালিক।'

'ভ্যানর ভ্যানর না করে কাজের কথা বলো,' ধমকে উঠলাম।

'জী, মালিক,' বলল বুড়ো। 'সর্দার ওয়াম্বের অধীনে কাজ করি আমি, ছোট একটা খামারের দেখাশোনা আমার দায়িত্ব। বেশ কিছুদিন থেকে খামারে উৎপাত চালাচ্ছে তিনটা বুনো হাতি। কাল রাতেও এসেছিল, বিশাল এক ভুট্টার খেত তছনছ করে দিয়ে গেছে। যদি ঠেকানো না যায় ওগুলোকে, আগামী মৌসুমে না খেয়ে মরতে হবে আমাদেরকে। হে শক্তিশালী শিকারী, আপনি কি সাহায্য করবেন আমাদের? দয়া করে চলুন আমার সঙ্গে, খতম করুন ওই পাগলা হাতিগুলোকে। আপনার জন্য ওটা পানির মত সহজ কাজ হবে। বলতে গেলে কোনও

কষ্টই হবে না আপনার—চাঁদ উঠলে একটা গাছের ডগায় চুপচাপ বসে থাকবেন, হাতিগুলোকে দেখামাত্র বন্দুকের গুলি ছুঁড়বেন। মরে যাবে ওরা। আমরা পরিত্রাণ পাব ওগুলোর অত্যাচার থেকে। সাহায্য করুন, মালিক... সাহায্য করুন!'

মনে মনে খুব খুশি হলাম এই প্রস্তাব পেয়ে, হাতি শিকার করতেই তো এসেছি এখানে। কিন্তু অভিনয় করলাম যেন পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা। গাঁইগুঁই শুরু করলাম, বুড়োকে রীতিমত কাকুতি-মিনতি করতে বাধ্য করলাম, তারপর রাজি হলাম যেতে। তবে শর্ত দিয়ে দিলাম, ওয়াম্বের কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠাতে হবে... তার আবাসস্থলে যেতে দু'দিন সময় লাগে... তাকে জানাতে হবে, আমি সশরীরে গোত্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। শ্রদ্ধা জানাব, সেই সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে তার এলাকায় হাতি শিকারের অনুমতি নেব। আকর্ষণ বাড়াবার জন্য এ-ও জানালাম, ওয়াম্বের জন্য দামি উপহার নিয়ে এসেছি। আসলে লোকটার সঙ্গে সামান্য ব্যবসা করবার ইচ্ছে আমার। এটা-সেটার বদলে কিছু আইভরি... মানে হাতির দাঁত কিনব। ওয়াম্বের ভাণ্ডারে প্রচুর আইভরি আছে বলে শুনেছি কিনা।

আমার শর্ত মেনে নিল বুড়ো। জানাল, যত শীঘ্রি পারে একজন বার্তাবাহক পাঠাবে ওয়াম্বের কাছে। তবে হাবভাবে বোঝা গেল, খবরটা কীভাবে নেবে তাদের গোত্রপ্রধান, সে-ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে তার। ওসব নিয়ে মাথা ঘামালাম না আমি। গোবোকে ক্যাম্প গোটাবার নির্দেশ দিলাম, তারপর রওনা হয়ে গেলাম বুড়োর সঙ্গে। গন্তব্যে যখন পৌঁছুলাম, তখন সূর্য ডুবু ডুবু করছে।

খামারে খুব বেশি মানুষ থাকে বলে মনে হলো না। গোটাদশেক কুঁড়েঘর দেখলাম, চারপাশে কাঁটাঝোপের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বড় এক পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো, পাশ দিয়ে নেমে গেছে এখানকার নদীটা। পাহাড়ি ঢাল ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত, তবে আদিবাসীদের আবাসস্থল পেরিয়ে উপরদিকে গেলে উন্মুক্ত মাটি নজরে পড়ে। ঢালের বিশাল এক অংশের গাছপালা কেটে ফেলে চাষের জমি তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বিশ-পঁচিশ একরের কম হবে না জায়গা। নদীর পানি পাওয়ায় ওখানকার মাটি চাষাবাদের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। ফসলি জমির একপাশে রয়েছে ভুট্টার গুদাম, সেখানে বাস করে এক বৃদ্ধা—আমাদের বুড়ো বন্ধুর প্রথম স্ত্রী।

জানা গেল, সতীনের সঙ্গে সংসারের অধিকার নিয়ে খিটিমিটি বাঁধায় এক ছাদের নীচে থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বুড়ি। দ্বিতীয় স্ত্রী কমবয়েসী, দেখতেও সুন্দরী, তাই স্বভাবতঃই তার পক্ষ নিয়েছে বুড়ো। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ স্বরূপ খেতের পাশের এই ঘরে এসে উঠেছে মহিলা। রাগের বশে ছুরি দিয়ে নিজের চেহারা পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলেছে সে।

যা হোক, ছোট ওই কুঁড়েঘরের একপাশে জন্মেছে বিশাল এক বাওবাব গাছ। খেতের দিকে এক পলক তাকাতেই বুঝতে পারলাম, হাতির উৎপাতের ব্যাপারে এক বিন্দু বাড়িয়ে বলেনি বুড়ো। ফসল পাকতে শুরু করেছিল, এর মাঝে প্রায় অর্ধেক জমি তছনছ করে দিয়ে গেছে প্রাণীগুলো। যা পেরেছে খেয়েছে, বাকিগুলো মাড়িয়ে দিয়ে গেছে ভারী পায়ের তলায়। ওগুলোর পায়ের ছাপ পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম, এত বড় ছাপ আগে কখনও দেখিনি। বিশেষ করে মদ্দা নেতা হাতিটার

পায়ের চাপে তৈরি হওয়া গর্তগুলোকে ছোটখাট চৌবাচ্চা বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

ঘুরে ফিরে দেখে নিলাম সব, এবার শিকারের জন্য প্রস্তুতি নেবার পালা। ইতোমধ্যে আমাকে দেখার জন্য খামারের আদিবাসীরা জড়ো হয়েছে, তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম—ফসলি জমির ওপারে, ঘন জঙ্গলে থাকে হাতিগুলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, বাকি ফসল নষ্ট করার জন্য আজ রাতে আবার ফিরে আসবে ওগুলো। আর ক'দিন পরেই পূর্ণিমা, তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, রাতে চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। মনটা উদ্বেল হয়ে উঠল; একটু বুদ্ধি খাটালেই বিনা ঝুঁকিতে এক বা একাধিক বিশাল হাতি শিকার করতে পারব। আফ্রিকার এসব হাতির ব্যাপারে হয়তো শুনেছেন আপনারা, অত্যন্ত আগ্রাসী স্বভাবের ওরা। এখানকার পরিস্থিতি আমার অনেকখানি অনুকূলে, খুশি হওয়াই স্বাভাবিক।

পরিকল্পনা সাজাতে বসলাম। খামারের ঘরবাড়ির ডানে, ভুট্টা খেতের উপরে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাওবাব গাছটা—ওটার কথা একটু আগে বলেছি আপনাদেরকে। ওই গাছেই ঘাপটি মারব বলে ঠিক করলাম। পুরো এলাকা কাভার করতে পারব মগডাল থেকে, হাতিগুলো এলে ওখান থেকে গুলিও ছুঁড়তে পারব অনায়াসে। সিদ্ধান্তটা জানালাম খামাররক্ষক বুড়োকে।

আমার কথা শুনে খুব খুশি হলো সে। বলল, 'বাঁচালেন, মালিক। আজ রাতে আমার লোকজন শান্তিতে ঘুমাতে পারবে। আপনার মত মহান সাদা শিকারী যদি পাহারায় থাকেন, তা হলে আর ভয় নেই কোনও।'

বিরক্ত হয়ে গালমন্দ করলাম ওকে। বলে কী? ঘুমাবে ওরা? আমি যেখানে মশার কামড় খেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের জন্য জেগে থাকব? যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়?

ক্ষমা চাইল বুড়ো। স্বীকার করল, অপ্রিয় হলেও উচিত কথা বলেছি আমি।

বকাঝকা খেলেও সে-রাতে খামারের প্রতিটা মানুষ... এমনকী বুড়োর ঈর্ষাপরায়ণ প্রথম স্ত্রীও... অন্যরকম এক আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিছানায় গেল। আমার উপর অগাধ আস্থা সৃষ্টি হয়েছে সবার, ভাবতে শুরু করেছে—হাতি বা অন্য কোনও হিংস্র পশু অন্তত আজ রাতে কোনও ক্ষতি করতে পারবে না ওদের।

খামার থেকে একটু দূরে ক্যাম্প করলাম আমরা। বুড়োর কাছ থেকে একটা কাঠের তক্তা চেয়ে নিলাম, ওটা নিয়ে বাঁধলাম বাওবাব গাছের দুটো সমান্তরাল ডালের মাঝখানে, মাটি থেকে প্রায় পঁচিশ ফুট উপরে। ওতে পা ঝুলিয়ে বসতে পারবে দুজন মানুষ, ক্লান্তি এলে কাণ্ডের গায়ে হেলান দিয়েও বসা যাবে অনায়াসে। সমস্যা একটাই—তক্তাটা বড্ড পুরনো, ঘুণেধরা। ওজনের চাপে ভেঙে পড়ে কি না, এ-ভয় রয়ে গেল। কিন্তু করার কিছু রইল না। এরচেয়ে ভাল কোনও তক্তা পেলাম না কোথাও।

প্রস্তুতি নেয়া হলে ক্যাম্পে ফিরলাম। খেয়ে নিলাম রাতের খাবার। চাঁদ ওঠার আধঘণ্টা আগে ডাকলাম গোবোকে। আজ সকালের অভিজ্ঞতায় ভাল নাড়া খেয়েছে ও, আমার সঙ্গে যাবার কথা শুনে মুখ বাঁকা করে ফেলল। পাত্তা দিলাম না ওসবে। আট বোরের রাইফেলটা ধরিয়ে দিলাম ওর হাতে। নিজে নিলাম এক্সপ্রেস রাইফেল, তারপর রওনা হলাম বাওবাব গাছের দিকে।

ঘনঘোর অন্ধকার চারদিকে। তবে গাছের কাছে পৌছুতে অসুবিধে হলে না। কাণ্ড বেয়ে উপরে উঠতে অবশ্য কিছুটা ধকল পোহাতে হলো, শেষ পর্যন্ত যখন তক্তাটায় উঠে বসলাম, তখন দু'জনেই হাঁপাচ্ছি। হাত-পায়ের চামড়া ছিলে গেছে অন্ধকারে গাছ বাইতে গিয়ে। জ্বলুনি সইলাম উপায়ান্তর না থাকায়, বন্দুক বাগিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম শিকারের দেখা পাবার আশায়। ধূমপানের তৃষ্ণা হলো, কিন্তু পাইপ জ্বালানোর সাহস পেলাম না। সকালের গণ্ডারটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তামাকের গন্ধ পেয়ে যেতে পারে হাতিগুলো। তাতে ফাঁস হয়ে যাবে আমাদের উপস্থিতি। ছটফট করতে থাকলাম পাইপ টানতে না পেরে। মনোযোগ ফেরাবার জন্য ডুবে গেলাম আপন চিন্তায়।

এক সময় চাঁদ হেসে উঠল আকাশে। কোমল আলোয় ভরে গেল বিশ্ব-চরাচর। বাতাসের মৃদু গোঙানির সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল পৃথিবী। অদ্ভুত এক পরিবেশের সূচনা ঘটল। চাঁদের ম্লান আলোয় নিঃসঙ্গ দেখাল দিগন্তজোড়া পর্বতমালা, ঘাসে ঢাকা সমতল আর ঘন জঙ্গলকে। মনে হলো স্বপ্ন দেখছি, চেনাজানা দুনিয়ার বাইরে অতুল শান্তি আর প্রকৃতির আদিমতা মেশানো কোনও প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে দৃষ্টিপটে। কেমন যেন একটা ঘুম ঘুম ভাব সবখানে। পাছার নীচে বড্ড শক্ত লাগছে কাঠের তক্তটাকে, নইলে হয়তো দু'চোখ মুদেই ফেলতাম! আবেগপ্রবণও হয়তো হয়ে পড়তাম প্রকৃতির এই নির্দোষ চেহারা দেখে। কিন্তু মাটি থেকে পঁচিশ ফুট উপরে, গাছের মাথায়... আধভেজা, শক্ত কাঠের তক্তায় বসে আবেগপ্রবণ হওয়া অসম্ভব। কেউই পারবে না সেটা। তাই স্রেফ নিজেকে মনে করিয়ে

দিলাম, দৃশ্যটা সুন্দর; আর কিছু না। সৌন্দর্যকে অগ্রাহ্য করে অখণ্ড মনোযোগ ঢেলে দিলাম হাতি দেখার আশায়।

এক ঘণ্টা কাটল নিস্তরঙ্গভাবে। আরও এক ঘণ্টাও পেরুল ঘড়ির কাঁটায় ভর করে। এখনও হাতির দেখা নেই। ক্লান্তি আর বিরক্তি অনুভব করতে শুরু করলাম। সারাদিনে ধকলও কম যায়নি। তাই নিজের অজান্তেই ঢলে পড়লাম তন্দ্রায়।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম মৃদু কণ্ঠের ডাক শুনে।

'মাকুমাজান!'

চোখ খুলে গোবোর দিকে তাকালাম। আবছা আলোয় দেখলাম—তর্জনী আর বুড়ো আঙুল একত্র করে সঙ্কেত দিচ্ছে ও... পরিচিত সঙ্কেত। তারমানে কিছু একটা দেখতে বা শুনতে পেয়েছে। চেহারায় উত্তেজনা খেলা করছে ওর। তাকিয়ে আছে খেতের প্রান্তদেশে শুরু হওয়া গাছগাছালির সারির দিকে। আমিও ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে কান পাতলাম।

খসখস শব্দ বাজল কর্ণকুহরে। বিশাল কোনও প্রাণীর আওয়াজ, ভুট্টার খেতে মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসছে। তার গায়ে ঘষা খাচ্ছে পাতা। চোখ পিটপিট করলাম, পরমুহূর্তে খেতের মাঝখানের একখণ্ড ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসতে দেখলাম একটা হাতিকে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। রীতিমত এক দৈত্য ওটা, একটা দাঁত নেই, অন্যটা কল্পনাতীত বড়, চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে। খেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাখার মত ঝাপটাচ্ছে দু'কান, শুঁড় তুলে বাতাস পরখ করছে। অভিভূতের মত তাকিয়ে থাকলাম আমি। একটা দাঁত নেই তো কী হয়েছে, যেটা আছে সেটার দামও কম হবে না। মনে মনে ওটার ওজন

আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় বেরিয়ে এল দ্বিতীয় হাতিটা। প্রথমটার মত লম্বা নয় এটা, তবে গায়ে-গতরে মোটাসোটা। দাঁতদুটোও আস্ত আছে। খানিক বিরতির পর ওদের তৃতীয় সঙ্গীও উদয় হলো। প্রথমদুটোর চেয়ে উচ্চতা কম এটার, তবে ঘাড়ের ঘের দ্বিতীয় হাতির চেয়ে বেশি। পরে মাপ নেবার সুযোগ পেয়েছিলাম; দেখেছিলাম, ছোট হাতিটার ঘাড়ের উচ্চতা পুরো বারো ফুট দেড় ইঞ্চি। আশা করি ওগুলোর আকৃতি বুঝতে পারছেন এতে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল ওরা কিছুক্ষণ। এক দাঁতের হাতিটাকে নেতা বলে মনে হলো, ওটাকে দেখলাম শুঁড় দিয়ে দ্বিতীয় হাতির গা ঘষে দিতে।

একটু পর খেতে শুরু করল ওরা। খেতের কাছে গিয়ে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল ভুট্টার গাছ, মাটি থেকে তুলে এনে গোগ্রাসে ঢোকাতে লাগল মুখের ভিতর। খেতের ভিতরটা আগেই মেপে নিয়েছি, আন্দাজ করলাম, মোটামুটি একশো বিশ গজ দূরে আছে তিন দৈত্য। রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে বটে, কিন্তু স্বল্প আলোয় এই দূরত্বে লক্ষ্যভেদ করা কঠিন। উপায়ান্তর না থাকায় অপেক্ষা করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছে হাতি তিনটে, ভুট্টা সাবাড় করতে করতে সামনে এগোচ্ছে। এগোচ্ছে বাওবাব গাছ আর বুড়ির ঘর লক্ষ্য করে। দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেল ওভাবে। উত্তেজনায় তখন আমার মরে যাবার দশা। অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছি। একবার ভাবলাম গাছ থেকে নেমে যাই মাটিতে। এগিয়ে গিয়ে গুলি ছুঁড়ি প্রাণীগুলোর দিকে। কিন্তু অমন কাজ স্রেফ পাগলামির পর্যায়ে পড়ে বলে পিছিয়ে গেছি। জোর করে শান্ত রাখলাম নিজেকে, মনকে প্রবোধ দিলাম—ধৈর্যের ফল

সবসময় মিঠে হয়।

পেট ভরার পর থেমে যেতে দেখলাম হাতিগুলোকে। ওরা তখন কুঁড়েঘর থেকে সত্তর গজ দূরে, চাষের জমির কিনারে। আমার অবস্থান থেকে ব্যবধান পঁচাশি গজের মত। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ বড় হাতিটাকে মাথা নাড়তে দেখলাম ভীষণভাবে। শুঁড় দিয়ে নিজের একমাত্র দাঁতটা স্পর্শ করে যেন সঙ্কেত দিল সঙ্গীদেরকে, পরমুহূর্তে তিনটা হাতিই এগোতে শুরু করল সামনে। খাচ্ছে না আর, কেন যেন বুড়ির কুঁড়ের দিকে এগিয়ে আসছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে।

রাইফেল বাগিয়ে চাঁদের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম, সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বাতাস বইছিল অনেকক্ষণ থেকে, সেই বাতাসের টানে ভেসে এসেছে কালো মেঘ। পাতলা মেঘের স্তর ইতোমধ্যে আলো কমিয়ে দিয়েছে, চোখের সামনে বড় বড় আরও দুটো মেঘের ভেলা ভেসে আসতে দেখলাম চাঁদের দিকে। একটা মেঘ সরু আর লম্বা, অন্যটা পুরু আর মোটা। হঠাৎ দেখায় কাঁচা হাতে আঁকা ঘোড়ার মুখের মত লাগে। কপাল মন্দ হলে যা হয়, হাতিগুলো পঁচিশ গজের মধ্যে আসতেই ঘোড়ামুখো মেঘটা ঢেকে ফেলল চাঁদকে। চারদিক ঢাকা পড়ে গেল আঁধারে। দৃষ্টিশক্তি হারালাম আমি, গুলি করতে পারলাম না।

আবছাভাবে কালো আকৃতিগুলোকে দেখলাম কেবল, কানে ভেসে এল খসখস শব্দ খুব কাছ থেকে। শাপ-শাপান্ত করলাম ভাগ্যকে। রাইফেল থেকে হাত সরালাম না। প্রথম সুযোগেই গুলি করব বলে ঠিক করেছি।

একটু পর সরতে শুরু করল মেঘ। বড় হাতিটার অবয়ব

ফুটে উঠল চোখের সামনে। কুঁড়ের কাছে পৌঁছে গেছে ওটা। দাঁত দেখলাম না, কারণ সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে ঘরের ভিতরে। ছনের চাল ভেদ করে দাঁত ঢুকিয়ে দিয়েছে প্রাণীটা, ভিতরে মজুত করে রাখা ভুট্টা গন্ধ পেয়েছে নিশ্চয়ই, সেগুলোর নাগাল পাবার চেষ্টা করছে।

আলো আরেকটু বেড়েছে, রাইফেলের ব্যারেল একটা ছোট ডালের ভাঁজে রাখলাম স্থিরতার জন্য, তারপর নিশানা ঠিক করতে লাগলাম। হঠাৎ কুঁড়ের ভিতর থেকে ভেসে এল ভয়ানক এক আর্তচিৎকার। তাড়াতাড়ি নিজের দাঁত বের করে আনল হাতি, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার ডগায় খামাররক্ষকের বৃদ্ধা স্ত্রীকে আটকে থাকতে দেখলাম, ঠিক শুকনো ঘাসের গায়ে আটকে থাকে পতঙ্গ! কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছিল বেচারি, হাতির দাঁত দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে, ওটাকে ধরে ফেলেছে জাপটে। এখন শূন্যে উঠে যাওয়ায় আর নামতে পারছে না, চেঁচাচ্ছে আতঙ্কে। কী সেই চিৎকার! আমার পুরো শরীর শিউরে উঠল নাকি গলার সেই ভয়াল আওয়াজে।

হাতিটাও ঘাবড়ে গেল। খাবারের সন্ধান করছিল, দাঁতের সঙ্গে জলজ্যান্ত একটা মানুষ উঠে আসবে, তা আশা করেনি মোটেই। বুড়ির চিৎকারে অস্থির হয়ে পড়ল। প্রকাণ্ড মাথাটা ঝটকা দিতে দেখলাম, দাঁত থেকে আলগা হয়ে বুড়ি উড়ে গিয়ে পড়ল নিচু একটা মিমোসা গাছের উপরে। ওখানে পড়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল।

লেজের ঝাপটা দিল হাতি, শরীর ঘোরাল মিমোসা গাছের দিকে, আক্রমণ করবে এখুনি। আর দেরি করার মানে হয় না। আট বোরের রাইফেলটা তাক করে টিপে দিলাম ট্রিগার।

বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। শান্ত পর্বতমালার গায়ে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূর। হাতিটাকে ধড়াম করে মাটিতে পড়ে যেতে দেখলাম। কিন্তু উল্লাসের সুযোগ পেলাম না। রাইফেলের ধাক্কার কারণে হোক, কিংবা বোকা গোবোর আচমকা নড়ে ওঠার ফলে... হঠাৎ ভেঙে পড়ল কাঠের তক্তাটা। গাছের উপর থেকে পড়ে গেলাম আমরা।

সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়লাম আমি। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল পুরো শরীর। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল, ঝনঝন করে উঠল মাথা। কয়েক মুহূর্তের জন্য চলৎশক্তি হারালাম। ব্যথাটা সয়ে এলেই তড়াক করে উঠে বসলাম। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, খুব একটা আঘাত পাইনি।

ওদিকে গুলির আঘাতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচাচ্ছে হাতিটা। ওর দুই সঙ্গী খেপে গেল সেই চিৎকার শুনে। ঘুরে দাঁড়াল। আক্রমণের পাঁয়তারা লক্ষ করলাম ওদের আচরণে। খুঁজছে হামলাকারীকে।

বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছি আমি। মাটি হাতড়াতে শুরু করলাম রাইফেলের খোঁজে, কিন্তু পেলাম না অস্ত্রটা। বুঝতে পারলাম, গাছের উপরে ডালের ভাঁজে আটকে রয়ে গেছে ওটা। এ-মুহূর্তে আবার গাছ বেয়ে উপরে ওঠা সম্ভব না আমার পক্ষে। এমন কোনও আশ্রয়ও নেই ধারেকাছে, যেখানে ছুটে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারি। গোবোকে খুঁজলাম, মাটিতে পড়েনি সে, গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলছে হাস্যকর ভঙ্গিতে। দ্বিতীয় রাইফেলটা এখনও হাতছাড়া করেনি।

হাতিগুলোর দিকে এক চোখ রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম, পিঠ ঠেকালাম গাছের গায়ে। ফিসফিসিয়ে ডাকলাম

গোবোকে। ওকে বললাম রাইফেলটা আমার কাছে নিয়ে আসতে। একটাই আশা দেখতে পাচ্ছি—হাতিগুলো সম্ভবত দেখতে পায়নি আমাকে। বাতাসের উজানে আছি, তাই গন্ধও পাবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু বেশিক্ষণ নিজেকে অদৃশ্য রাখতে পারব না। রাইফেলটা পেতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।

গোবোর কথা কী আর বলব... আমার কথা শুনতে পায়নি, নাকি গাছের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে নড়তে চাইছে না, কে জানে... রাইফেলটা দিল না আমাকে। পরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলেছিল, ডাক শোনেনি আমার। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করি না আমি। ব্যাটা একটা ভীতুর ডিম। উন্মত্ত হাতির সামনে গাছ থেকে নামার সাহস পায়নি নিশ্চয়ই।

যা হোক, রাইফেল না পাওয়ায় ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করলাম। গাছের পিছনে এসে ঘাপটি মারলাম, অপেক্ষা করতে থাকলাম হাতির আক্রমণের জন্য। এরপরই ঘটল এক আজব ঘটনা।

সঙ্গীর অসহায় আর্তনাদে বোধহয় বিচলিত হয়ে পড়ল দুই হাতি। মাটিতে পড়ে কাঁপছে ওটা, কাঁধের ক্ষত দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। আক্রমণের ইচ্ছা বাতিল করে ওরা চলে গেল পড়ে থাকা প্রাণীটার দিকে। পাশে পৌঁছুতেই চিৎকার থামাল আহত হাতি। ওর গায়ে শুঁড় বুলিয়ে দিল দু'জনে, তারপর হাঁটু গেড়ে বসল। কী করছে, বুঝলাম না প্রথমে। হঠাৎ দেখলাম, উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে আহত হাতি। শুঁড় আর দাঁতের সাহায্যে তাকে সাহায্য করছে দুই সঙ্গী। ধীরে ধীরে পুরোপুরি খাড়া হয়ে গেল প্রাণীটা, তাকে দু'পাশ থেকে ঠেস দিয়ে স্থির থাকতে সাহায্য করল অন্যেরা। কিছুক্ষণ পর খামারের বাড়িঘরের দিকে

ধীর কদমে চলে যেতে দেখলাম ওদেরকে।*

কিছুদূর হাঁটার পর শক্তি ফিরে পেল আহত হাতি, দুই সঙ্গীকে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে ওরা, বাড়িঘরের দিককার পথটা সবচেয়ে সহজ বলে ওইদিকেই যাচ্ছে। এরপর কী ঘটল, তা দেখার সুযোগ পেলাম না। কারণ আবারও মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। ঘনঘোর অন্ধকারে ছেয়ে গেছে পুরো এলাকা। নানা রকম শব্দ কানে এল, অনুমান করতে পারলাম পরের ঘটনা।

আঁধারে সম্ভবত বিভ্রান্ত হয়ে গেল প্রাণীগুলো। বেড়ার কাছে পৌঁছে থামল না। ভেঙেচুরে ঢুকে পড়ল খামারের আবাসিক অংশটার ভিতরে। থামল না এরপরও, ছুটতে থাকল আপন গতিতে। মেঘ সরে গিয়ে সামান্য আলো বেরিয়ে আসায় দেখলাম, জায়গাটা তছনছ করে দিচ্ছে ওরা।

একটা কুঁড়ে ঢাকনার মত উপুড় হয়ে গেল হাতির ধাক্কায়, দুটো পুরো চ্যাপ্টা হয়ে গেল, আরেকটা কুঁড়ের একাংশ ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মত। ভিতর থেকে চাকভাঙা মৌমাছির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল অধিবাসীরা, লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সরে যেতে থাকল উন্মত্ত তিন হাতির সামনে থেকে। ছুটতে ছুটতে ওখানে যখন পৌঁছুলাম আমি, পুরো জায়গাটা ধ্বংস করে দিয়ে পালিয়ে গেছে হাতিরা। সৌভাগ্যক্রমে মারা পড়েনি আদিবাসীদের একজনও। টুকটাক আহত হয়েছে, তবে হাতির

কাহিনির এ-অংশ কিছুটা আজগুবি মনে হয়েছে আমাদের সবার কাছে, কোয়াটারমেইন সম্ভবত নাটকীয়তার জন্য অমন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। পাঠকদেরকেও গল্পের খাতিরে ঘটনাটা মেনে নেবার জন্য অনুরোধ করছি— সম্পাদক।

পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে ধরাধাম ত্যাগ করতে হয়নি কাউকে।

ওখানে পৌঁছে বুড়ো খামাররক্ষককে হাস্যকর অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। তার ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে, তার সামনে তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, যেন বোলতার কামড় খেয়েছে স্পর্শকাতর কোনও জায়গায়।

আমাকে দেখতে পেয়েই যেন মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল তার। মুখ খারাপ করে গালাগাল দিতে শুরু করল। জাদুকর, ভণ্ড, দুর্ভাগ্যের ফেরিঅলা... ইত্যাদি বলে আখ্যা দিচ্ছে। হাতিগুলোকে শিকারের আশ্বাস দেবার পরেও নাকি বেঈমানী করেছি আমি, ওগুলোকে পাঠিয়েছি উল্টো বুড়োকেই খতম করতে।

বলা বাহুল্য, এ-ধরনের অপমান সহ্য করতে রাজি নই আমি। গাছ থেকে আছড়ে পড়ে ব্যথা পেয়েছি। আরেকটু হলে হাতিগুলোর কবলে পড়তাম... সবই এদের উপকার করতে গিয়ে! এরপর আর গালাগাল সহ্য হয় কারও? ঘাড় চেপে ধরলাম বুড়োর, হিড়হিড় টেনে নিয়ে গেলাম তার ভাঙা বাড়ির দরজার কাছে—ধ্বংসযজ্ঞের পরে শুধু ওটাই দাঁড়িয়ে আছে।

দরজার গায়ে মাথা ঠুকে দিলাম লোকটার। হিসিয়ে উঠে বললাম, 'ব্যাটা বুড়ো নচ্ছার! আমাকে গালি দিচ্ছিস? পুরনো পচা তক্তা কে দিয়েছে আমাকে? ওটা ভেঙে পড়ায় ব্যর্থ হয়েছি আমি, মারাও যেতে পারতাম। দোষটা কার? নিজের সমস্যা নিয়ে হৈচৈ বাধাচ্ছিস, অথচ আর কারও কথা ভেবেছিস? তোর বুড়ি বউকেও তো ঘর থেকে বের করে এনেছে হাতি, ছুঁড়ে ফেলেছে গাছের উপরে... কই, একবারও তো তার কথা জানতে চাইলি না!'

আরেক দফা ঠুকে দিলাম তার মাথা।

'দয়া করুন, মালিক, দয়া করুন!' তাড়াতাড়ি হাতজোড় করল বুড়ো। 'বুঝতে পারছি, বিরাট ভুল হয়ে গেছে আমার।'

'তা তো হয়েছেই,' আবার ঠুকলাম তার মাথা।

'মাফ করে দিন, হে সাদা শিকারী,' বলল বুড়ো। 'তক্তাটা যে খারাপ, তা জানা ছিল না আমার। আর আমার বউয়ের কথা কী বলছেন? ও কি মারা গেছে? হায়... বড়ই দুঃখজনক। কিন্তু হয়তো সবার মঙ্গলের জন্যই জীবন গেছে ওর।'

দু'হাত একত্র করে আকাশের দিকে তাকাল সে। বিড়বিড় করে সম্ভবত প্রার্থনা করল বউয়ের জন্য।

ওকে ছেড়ে হেসে উঠলাম। বউয়ের খবর শুনে আসলে দুঃখ পায়নি সে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। বুড়ির অত্যাচারে সম্ভবত অতিষ্ট হয়ে উঠেছে লোকটা।

'প্রার্থনা থামাও,' বললাম ওকে। 'তোমার বউ মরেনি। একটা কাঁটাঅলা মিমোসা গাছের উপরে আটকে আছে। ব্যথায় চেঁচামেচি করতে শুনেছি ওকে। মরা মানুষ চেঁচাতে পারে না।'

মুখ কালো হয়ে গেল বুড়োর। মাথা নাড়ল হতাশ ভঙ্গিতে। বলল, 'দেবতাদের ইচ্ছা বোঝা দায়। ঠিক আছে, থাকুক ও ওভাবে। সময় হলে নিজেই গাছ থেকে নেমে আসতে পারবে।'

সঙ্গী-সাথীদের দিকে চলে গেল লোকটা। তাদেরকে সাহায্য করল ধ্বংসস্তূপ থেকে দরকারি জিনিসপত্র বের করে আনতে।

ওর অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করে একটু পর সত্যি সত্যি হাজির হলো বুড়ি। কাঁটার আঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু সাংঘাতিক কিছু হয়নি। ভয়ে কাঁপছে কেবল।

আপাতত আর কিছু করার নেই। ক্যাম্পে ফিরে এলাম

আমি। কপাল ভাল, ওখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়নি হাতিরা। যথেষ্ট ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে, তাই আর জেগে থাকলাম না। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম নিজের তাঁবুতে।

হাতিগুলোর সঙ্গে আমার প্রথম মোকাবেলার সমাপ্তি ঘটল এভাবে।

চার

শেষ মোকাবেলা

শরীরে ব্যথা-বেদনা নিয়ে ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে। আগের দিনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম সৃষ্টিকর্তার প্রতি, এখনও বেঁচে আছি বলে। মোষ, গণ্ডার আর বুনো হাতি মিলে কী ভীষণ ফাঁড়াটাই না গেছে গতকাল। যে-কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারতাম। বেঁচে থাকার পিছনে নিজের চেয়ে ভাগ্যের ভূমিকা বেশি।

এরপরেও কাল রাতে দেখা চমৎকার আইভরিগুলোর কথা ভুলতে পারলাম না। লোভ জেগে উঠল মনের ভিতর, ওগুলো হাতে পেতে উন্মুখ হয়ে উঠেছি। দুর্বার এক নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, বুঝতে পারলাম—ওই আইভরি হাতে পাবার একটাই উপায় আছে, তা হলো বন্দুক হাতে নিয়ে হাতিতিনটেকে ধাওয়া

করা... শিকার করা। তা-ই করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

নাশতাশেষে ডেকে পাঠালাম আমার কুলি-বাহিনীকে। ওদেরকে জানালাম, হাতিগুলোর পিছু নেব বলে ঠিক করেছি। ওগুলোকে বাগে না পাবার আগ পর্যন্ত কিছুতেই ফিরব না। দরকার হলে নরক পর্যন্ত তাড়া করব। আমার খেপাটে কথাবার্তা পছন্দ হলো না কুলিদের, কিন্তু প্রতিবাদ করল না কেউই। গোবোকে বন্দুক দেখানোর পর থেকে আমাকে যমের মত ভয় পায় ওরা।

বৃদ্ধ খামাররক্ষকের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিলাম। সে তখন দুই সহধর্মিণীকে নিয়ে ভাঙা বাড়ি নতুন করে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে। রাগ-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে দুই বউ। বিপদ-আপদ আসলে মানুষের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে জানে।

বুড়োকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। সেই সঙ্গে চাইলাম কিছু শুকনো খাবার... গতরাতের কষ্টের পারিশ্রমিক হিসেবে। মুখ কালো করে ফেলল লোকটা, কিন্তু আমার সঙ্গে ঝামেলা করার সাহস পেল না। তাড়াতাড়ি একটা বস্তায় ভরে কিছু শাকসবজি আর ভুট্টা তুলে দিল আমার হাতে। ওগুলো নিয়ে ধন্যবাদ জানালাম ওকে। চলে এলাম খামার ছেড়ে। এরপর ওদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা আর জানি না। আর কোনোদিন ফেরা হয়নি ওই খামারে।

ক্যাম্প গুটিয়ে হাতির ট্র্যাক ধরে অনুসরণ করতে শুরু করলাম এরপর। পাহাড়ি ঢাল ধরে নীচের দিকে নেমেছে ওরা, মাইলদুয়েক ভালই এগোনো গেল, কিন্তু তারপর থেকে দেখা দিল সমস্যা। নদী আর জলাভূমিকে বেষ্টন করে থাকা জমি

পাথরের মত শক্ত, পায়ের ছাপই পড়েনি বলতে গেলে। আহত হাতির গা থেকে ঝরা রক্ত অনুসরণ করছিলাম, কিন্তু একটু পর হারিয়ে ফেললাম তা-ও। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল, রক্তের দাগ আর অল্প-স্বল্প ছাপ যা ছিল, সব ধুয়ে নিয়ে গেছে বৃষ্টির পানি।

হাল ছাড়বার পাত্র নই আমি। সমস্যা হলেও থামলাম না। এগোতে থাকলাম সামনে, তবে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। হাতির পায়ের চাপে সমান হয়ে যাওয়া ঘাস আর ভাঙাচোরা ঝোপঝাড় এখন আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছে। মাঝেমধ্যে রক্তের দাগও আবিষ্কার করছি, মাটির গভীরে ঢুকে গেছে, ভারী বর্ষণ না হওয়ায় পুরোপুরি মিশে যায়নি।

জলাভূমির কিনারে পৌঁছুতে ঘণ্টাখানেক লাগল, তবে এরপর সহজতর হয়ে এল আমাদের কাজ। ওখানকার নরম মাটিতে তিন দৈত্যের হাজারো ছাপ ফুটে আছে। নলখাগড়ার জঙ্গল ভেদ করে নদীর অগভীর একটা অংশে পৌঁছুলাম একটু পর। ওখানকার আলামত দেখে বোঝা গেল, কাদায় গড়াগড়ি দিয়েছে আহত হাতি, ক্ষতস্থান কাদা মেখে সম্ভবত বন্ধ করতে চেয়েছে রক্তপাত, সেইসঙ্গে ব্যথা কমাবার জন্য বিশ্রাম নিয়েছে। দুই সঙ্গীর সাহায্য নিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ওটা।

অগভীর অংশটা পেরিয়ে অন্যপাশের জলাভূমিতে ঢুকলাম আমরা। সেটা পেরিয়ে উঠে এলাম ন্যাড়া জমিতে। এদিকটায় বৃষ্টি হয়নি, তাই মাটিতে রক্তের দাগ রয়ে গেছে। সেটা ধরে বেশ সহজেই অনুসরণ করা গেল তিন হাতিকে।

সারাদিন ওদেরকে ধাওয়া করলাম আমরা। কখনও উন্মুক্ত প্রান্তর ধরে, কখনও বা ঝোপঝাড় বা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, ক্ষণিকের জন্যও আর থামেনি প্রাণীগুলো, ছন্দোবদ্ধভাবে এগিয়ে গেছে। আহত হাতিটা যে ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পেয়েছে, তার আলামত দেখা গেল। পায়ের কদম মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দুই সঙ্গীর সাহায্য ছাড়াই এগোতে পেরেছে ওটা।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মোটামুটি আঠারো মাইল পেরিয়ে এসেছি আমরা ততক্ষণে, ক্লান্তি ভর করেছে দেহে। ক্যাম্প করার নির্দেশ দিলাম কুলিদেরকে। খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়লাম সেদিনকার মত।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই জেগে উঠলাম আমরা। পুবাকাশ ফর্সা হয়ে এলে ক্যাম্প গুটিয়ে ফের পথে নামলাম। হাতিরা যেখানে রাত কাটিয়েছে, সেখানে পৌঁছুলাম সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। আশপাশের ঝোপঝাড়ের দশা দেখে বোঝা গেল, সুস্থ দুই হাতি খাওয়াদাওয়া করেছে, কিন্তু আহতটা খায়নি কিছুই। বড় একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাত পার করেছে ওটা, শরীরের ভারে একদিকে হেলে পড়েছে গাছটা।

এখান থেকে ওরা খুব বেশিক্ষণ আগে রওনা হয়েছে বলে মনে হলো না। বেশিদূর যেতেও পারেনি নিশ্চয়ই। রাতটা বিশ্রাম নেয়ায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে আহত হাতির কাঁধ, ওকে এগোবার জন্য সাহায্য করতে হবে বাকি দুই সঙ্গীকে। তারপরও হাতির গতি কম নয়। আপাতদৃষ্টিতে শম্বুকগতি মনে হলেও ওরা আসলে এগোতে পারে খুব দ্রুত। ঝোপঝাড় বা ছোটখাট জঙ্গল... যা মানুষের অগ্রগতি রুদ্ধ করে দেয়, সেগুলো হাতির চলার পথে কোনও বাধাই না।

অনুসরণ শুরু করার পর লক্ষ করলাম, বাঁয়ে মোড় নিয়ে

অর্ধবৃত্তাকার পথে এগিয়েছে প্রাণীগুলো—পর্বতমালার দিকে যাচ্ছে। সম্ভবত নদীর অন্যপারে ওদের পরিচিত তৃণভূমিতে ফিরে যাবার ইচ্ছে।

আপাতত ট্র্যাক ধরে এগোনো ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের। ধৈর্য ধরে সে-কাজই করলাম। একটু পরেই রোদ চড়ে গেল, সে-উত্তাপে ভাজা ভাজা হতে হতে দিনভর পথ চললাম আমরা, কিন্তু কিছুতেই নাগাল পেলাম না তিন হাতির। চলতে চলতে নানা রকম শিকারের দেখা পেলাম, এমনকী দেখা পেলাম অন্য হাতির পায়ের ছাপেরও। আমার সঙ্গী-সাথীরা সেসবের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাল, কিন্তু পাত্তা দিলাম না। গোঁ চেপে গেছে, তিন হাতির দাঁত পাবার আগে আর কোনও শিকারের দিকে ফিরেও তাকাব না। মনঃক্ষুণ্ন হলো কুলিরা, উপায়ান্তর না দেখে অনুসরণ করল আমাকে।

সন্ধ্যা নাগাদ শিকারের বেশ কাছাকাছি পৌঁছুতে পারলাম আমরা। বড়জোর পোয়া মাইল দূরে আছে হাতিরা। কিন্তু তখন আমরা ঘন জঙ্গলের ভিতরে। ঘন হয়ে জন্মানো ঝোপঝাড় আর গাছপালা ভেদ করে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। অন্ধকারে অমন পথে এগোনো সম্ভব নয়, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ক্যাম্প করতে বাধ্য হলাম। হতাশায় ছেয়ে গেল অন্তর, শাপ-শাপান্ত করলাম ভাগ্যকে।

সে-রাতে চাঁদ উঠল। ঘুম আসছিল না, তাই পাইপ ধরিয়ে একটা গাছের গোড়ায় বসলাম, আয়েশ করে টান দিলাম তাতে। হঠাৎ শুনতে পেলাম বৃংহতি, আওয়াজে মনে হলো কোনও কারণে ঘাবড়ে গেছে প্রাণীটা। আন্দাজ করলাম, খুব বেশি হলে তিনশো গজ দূরে হয়েছে শব্দটা। কাহিল লাগছিল সারাদিনের পথশ্রমে, কিন্তু কৌতূহলের কাছে হার মানল শারীরিক ক্লান্তি।

কুলিরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, ওদেরকে আর জাগালাম না, আট বোরের রাইফেল আর বাড়তি কিছু কার্তুজ নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম শব্দের উৎসের দিকে।

যেদিক লক্ষ্য করে সারাদিন এগিয়েছি, সেদিক থেকেই শোনা গেছে হাতির ডাক। সরু একটা পথের মত দেখতে পেলাম, হাতির পায়ের চাপে ঝোপঝাড় সমান হয়ে গেছে, আবছা একটা রেখার মত লাগছে ওটাকে। অতি সতর্কভাবে, পা টিপে টিপে এগোলাম দুইশ' গজ, তারপরই চোখের সামনে ভেসে উঠল বনের মাঝখানে সুন্দর একটা ফাঁকা জায়গা, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে একশো গজের মত। চারপাশের ঝোপঝাড় আর চিরহরিৎ গাছ মিলে যেন পাঁচিল তৈরি করে রেখেছে সীমানায়।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে সতর্ক হতে শিখেছি, তাই ফাঁকা জায়গায় পা রাখার আগে থামলাম। আড়াল থেকে নজর বোলালাম ওখানে। পরিষ্কার হয়ে গেল, কেন ওভাবে ডাক ছেড়েছে হাতি। ফাঁকা জায়গার ঠিক মাঝখানে কেশর ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল সিংহ। মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে, চাপা গরগরানি বেরুচ্ছে গলা দিয়ে, লেজ নাড়ছে অস্থির ভঙ্গিতে।

হঠাৎ ওটার চল্লিশ গজ দূরে আলোড়ন উঠল ঘাসের মাঝে। পরমুহূর্তে বিদ্যুতের মত লাফিয়ে ফাঁকায় বেরিয়ে এল এক সিংহী। নিঃশব্দে এগোল মদ্দাটার দিকে। পাশে গিয়ে থামল, তারপর মাথা ঘষতে শুরু করল সঙ্গীর ঘাড়ে। দু'জনেই গরগর করতে থাকল এবার। এত জোরে যে, মনে হলো একশো গজ দূর থেকেও লোকে শুনতে পাবে ওই আওয়াজ।

ইতিকর্তব্য স্থির করতে না পেরে চুপচাপ বসে রইলাম

অনেকক্ষণ। এর মাঝে আমার গন্ধ পেল সিংহরা, নাকি শিকারের সন্ধানে যাবার সিদ্ধান্ত নিল, কে জানে; হঠাৎ নড়ে উঠল পশুদুটো। মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করল, বাঁয়ের জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে। আর কোনও সিংহ উদয় হয় কি না, তা দেখার জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমি, কিন্তু দেখলাম না একটাও। দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, মনে হলো সিংহগুলোর ভয়ে চলে গেছে হাতিরা, খামোকাই রাতদুপুরে এসেছি এদিকে।

ফিরে যাবার জন্য উল্টো ঘুরলাম, আর তখুনি ফাঁকা জায়গার একপ্রান্ত থেকে ভেসে এল গাছের মরা ডাল ভাঙার মৃদু শব্দ। যেন কেউ পা ফেলেছে ওতে। ঝট্ করে ওদিকে ফিরলাম, সিদ্ধান্ত নিলাম ব্যাপারটা কী দেখার জন্য। ছায়ায় মিশে সন্তর্পণে ফাঁকা জায়গাটা পাড়ি দিলাম আমি, শব্দটা যেদিকে হয়েছে, সেদিকে এগোতে থাকলাম।

ওপাশের জঙ্গলে আবার দেখতে পেলাম হাঁটাপথটা। বুক দুরু দুরু করছে, কিন্তু থামলাম না। কী এক দুর্বার আকর্ষণ যেন টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে। জঙ্গল এখানে এত ঘন যে মাথার উপর নিরেট ছাদ সৃষ্টি করেছে গাছের ডাল আর পাতা। বহু কষ্টে ঢুকছে এক চিলতে চাঁদের আলো। এগোতে হচ্ছে প্রায় আন্দাজের উপর ভর করে। একটু পর খানিকটা প্রশস্ত হয়ে এল রাস্তা। সেটা ধরে দ্বিতীয় একটা ফাঁকা জায়গার সন্ধান পেলাম, প্রথমটার চেয়ে এটা অনেক ছোট। ওখানেই দেখা মিলল পরম প্রত্যাশিত তিন হাতির।

আমার ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আহত প্রাণীটা, শরীরের ভর চাপিয়ে দিয়েছে একটা মরা গাছের গায়ে।

চেহারা-সুরতে দুর্বলতার ছাপ প্রকট হয়ে আছে। ওটার পাশে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় হাতি। সতর্ক হাবভাব। বার বার মাথা ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে এদিক-সেদিক। শেষ হাতিটা আমার সবচেয়ে কাছে। একপাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আড়াল থেকে ওদের উপর নজর রাখছি, হঠাৎ নড়ে উঠল ওটা। লম্বা কদম ফেলে হারিয়ে গেল ডানদিকের গাছপালার ভিতর।

কী করব, ভাবতে শুরু করলাম। দুটো পথ আছে। এক, ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারি। দলবল নিয়ে ফিরে আসতে পারি দিনের আলোয়। দুই, এখুনি হামলা চালাতে পারি ওদের উপর। প্রথম পথটাই যুক্তিসঙ্গত এবং নিরাপদ। চাঁদের আলোয় একাকী একটা হাতির মোকাবেলা করাই যথেষ্ট বিপজ্জনক, তিনটার বিরুদ্ধে নামা তো রীতিমত পাগলামির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সমস্যা হলো, যদি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি, ওদেরকে এখানে আর পাব না। আরেকটা কষ্টকর দিন ব্যয় করতে হবে ওদের পিছনে ছুটোছুটি করে। তাতেও সফল হব, এমন নিশ্চয়তা নেই।

'না!' মনে মনে ভাবলাম। 'ভয় পেয়ে লাভ নেই। ভীতু লোকের কপালে অমন সুন্দর আইভরি জোটে না। ঝুঁকি নেব আমি, খতম করব ওদেরকে। কিন্তু কীভাবে?'

সরাসরি এগোনোর উপায় নেই। খোলা ময়দানে আমাকে দেখতে পাবে ওরা। একমাত্র বিকল্প হলো, খোলা জায়গাটার সীমানা ঘেঁষে ছায়ায় ছায়ায় এগোনো। একটু ঘুরপথে পৌঁছুতে হবে ওদের পিছনে। তারপর অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে। তা-ই করতে শুরু করলাম। সন্তর্পণে এগোলাম ঝোপঝাড় আর গাছপালার আড়াল ব্যবহার করে।

যে-পথটা ধরে তৃতীয় হাতিটা চলে গেছে, সেটার মুখে

পৌঁছুলাম সাত-আট মিনিট পর। অন্য দুটো হাতি এখন আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। কিন্তু ঝোপঝাড়ের পাঁচিল এখানে এমনভাবে শেষ হয়ে গেছে যে, ওদের চোখ এড়িয়ে আর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। ইতস্তত করলাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর তৃতীয় হাতিটার ব্যবহার করা পথ ধরে এগোতে শুরু করলাম। পাঁচ গজ দূরে ওটা বাঁক খেয়ে গেছে বুনো এক ঝোপের আড়ালে। ওখান থেকে উঁকি দেবার চিন্তা করে পা বাড়ালাম, ভাবলাম হয়তো লেজ দেখব হাতিটার, কিন্তু বাস্তবে ঘটল উল্টো ঘটনা।

মাথা বের করার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল শুঁড়। থমকে গেলাম, হারালাম চলৎশক্তি। আমার বিস্ফারিত চোখের সামনে ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল তৃতীয় হাতিটা। কী করব ভেবে পেলাম না, আমার শরীর থেকে বড়জোর পাঁচ গজ দূরে আছে ভয়ানক প্রাণীটা। আমাকে দেখতে পেয়ে সে-ও থমকে দাঁড়াল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবী যেন স্থির হয়ে গেল। পরক্ষণেই খেপে গেল হাতি। শুঁড় উঁচু করে কপালে ঠেকাল—আক্রমণের পূর্ব-সঙ্কেত। মহাবিপদে পড়ে গেলাম। ঘন ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে ডানে বা বাঁয়ে যাবার উপায় নেই। ওর দিকে পিঠ ফেরানোরও সাহস পাচ্ছি না। তাই একমাত্র উপায়টাই বেছে নিলাম, রাইফেল উঁচু করে গুলি করলাম প্রাণীটার বুক বরাবর। অন্ধকারে নিশানা ঠিক করা সম্ভব নয়, কালো অবয়বটার মাঝখান লক্ষ্য করে ট্রিগার চেপে দিয়েছি।

রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান হয়ে গেল রাইফেলের আওয়াজে। গুলি খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল হাতিটা। শুঁড় নামিয়ে ফেলল, স্থির হয়ে গেল পাথুরে ভাস্কর্যের মত। স্বীকার করতে দোষ নেই,

বিহ্বল হয়ে পড়েছি আমি, উপস্থিতবুদ্ধি হারিয়েছি। দ্বিতীয় ব্যারেল থেকে গুলি ছোঁড়া উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ, কিন্তু ছুঁড়লাম না। তার বদলে কাঁপা হাতে খুলে ফেললাম রাইফেল, ডান ব্যারেলের খালি কার্তুজ ফেলে দিয়ে নতুন একটা ভরায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম। ব্রিচ আবার জোড়া দেবার আগেই হিংস্র আওয়াজ্ শুনলাম। আঁতকে উঠলাম চোখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে। স্থবিরতা কেটে গেছে হাতিটার, আমাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। শুঁড়টা আবার উঠে গেছে উপরে।

এই দৃশ্য দেখার পর সাহস হারিয়ে ফেললাম। কীসের গোলাগুলি, উল্টো ঘুরে পিঠটান দিলাম। ছুটতে শুরু করলাম পাগলের মত। আমার পিছু পিছু ধেয়ে এল দানবটা। ছিটকে খোলা ময়দানে বেরিয়ে এলাম আমি, পিছনের শব্দ থেকে বুঝতে পারলাম, দৌড়ে হার হতে চলেছে আমার। এক্ষুণি আমাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলবে হাতিটা।

ভাগ্যদেবী হঠাৎ সদয় হয়ে উঠলেন। খোলা জায়গায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে শুরু করল আমার বুলেট। সম্ভবত ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিতে পেরেছি, হাতিটা আচমকা টলে উঠে আছড়ে পড়ল মাটিতে। জান বেরিয়ে গেছে একই সঙ্গে।

বিপদ তাতে কাটেনি। বরং ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিয়েছি বলা চলে। পিছনের হাতিটার পড়ে যাবার শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। পরমুহূর্তে খেয়াল করলাম, মাত্র পনেরো কদম দূরে দণ্ডায়মান হয়ে আছে অন্য দুটো হাতি। ফ্যাল ফ্যাল করে নিহত সঙ্গীকে দেখল, তারপর তাকাল আমার দিকে। আচমকা টের পেল কী ঘটেছে, পরমুহূর্তে শুঁড় উঁচিয়ে দু'জনেই একযোগে

ছুটে এল আমার দিকে। বেকায়দা অবস্থা... দু'দিক থেকে আসছে ওরা, কোনোমতে ঝটকা দিয়ে জোড়া দিলাম রাইফেল, তারপর সামান্য উঁচু করেই ট্রিগার চাপলাম তাড়াহুড়োর ভঙ্গিতে। কাছের হাতিটার মাথার দিকে গুলি চালিয়েছি।

আফ্রিকান হাতির ব্যাপারে হয়তো আপনারা জানেন, ভারতীয় হাতির মত অবতল নয় ওদের মাথার খুলি, বরং উত্তল। ওদের মাথার দিকে গুলি চালানো বোকামি, কারণ হাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে বুলেটের গতি কমে যায়। তবে একটা স্পর্শকাতর জায়গা আছে, ওটা ভেদ করতে পারলে নাসারন্ধ্রের ফুটো দিয়ে মগজ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে বুলেট।

ভাগ্য আমার খুবই ভাল, তাড়াহুড়ো করে গুলি করলেও জায়গামত লাগাতে পারলাম। একেবারে মগজে সেঁধিয়ে গেল বুলেট। ছুটন্ত অবস্থাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রাণীটা, মাটি কাঁপিয়ে ভূপাতিত হলো। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ওসব দেখছি না আমি, প্রথম গুলিটা ছুঁড়েই চরকির মত ঘুরলাম, রাইফেল তাক করতে লাগলাম দ্বিতীয় হাতির দিকে। এটা ওই আহত হাতিটা—একটামাত্র দাঁতঅলা, দলের সর্দার। ততক্ষণে আমার প্রায় গায়ের উপর এসে গেছে ওটা, বিকট এক মূর্তির ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছি আমি।

ওটার গলা লক্ষ্য করে ট্রিগার চাপলাম, কিন্তু গুলি বেরুল না। মনে পড়ে গেল, রাইফেলের দ্বিতীয় ব্যারেলটা আধা-কক করে রেখেছি। অস্ত্রটার লকে সমস্যা আছে, কিছুদিন আগে শিকার করার সময় জ্যাম হয়ে গিয়েছিল বামের ব্যারেল। রিকয়েলের ধাক্কায় মাটিতে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। সেই থেকে গুলি ছোঁড়ার দরকার না হলে পুরোপুরি কক করি না

ব্যারেলটা। আজও করিনি। এখন সেটাই বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ করল।

এখন আর কক করার সময় নেই, মরিয়া হয়ে ডানদিকে ঝাঁপ দিলাম। লাফটা খুব ভাল হলো না, কিন্তু জান বাঁচল কোনোক্রমে। আমি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে নেমে এল হাতির পা, যদি সরতে না পারতাম, নির্ঘাত ভর্তা হয়ে যেতাম। অবশ্য ভর্তা না হলেও হাতির পায়ের একটা ধাক্কা লাগল শরীরে, উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে আছড়ে পড়লাম।

মাটিতে পড়ে বেশ ব্যথা পেলাম, কোনোমতে সহ্য করলাম তা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম, তারপর ছুটতে শুরু করলাম প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। তাড়া খাওয়া হরিণের মত দৌড়াচ্ছি, হাত থেকে ফেলিনি রাইফেলটা; যে-পথে এসেছিলাম, সেটা ধরেই ক্যাম্পে ফেরার ইচ্ছে। আশা করছি জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারলে স্বল্প আলোয় আমাকে আর দেখতে পাবে না দৈত্যটা।

উল্কার মত পার হতে শুরু করলাম ফাঁকা জায়গাটা। এমনিতে হাতির সঙ্গে দৌড়ে পেরে ওঠার কথা না, কিন্তু আহত বলে গতি কমে গেছে দৈত্যটার। তারপরেও আমার চেয়ে আস্তে ছুটছে না। হাজার চেষ্টা করেও দু'জনের মাঝে ব্যবধান বাড়াতে পারলাম না। আমার মাত্র তিন ফুট দূর থেকে ধেয়ে আসছে খুনে হাতি।

ময়দানের অন্যপ্রান্তে পৌঁছে গেলাম, কিন্তু এক নজরে বুঝতে পারলাম, হিসেবে গড়বড় করে ফেলেছি। ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে আসা পথটার মুখ ফেলে এসেছি পিছনে, যেখানটায় পৌঁছেছি, সেখান দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়। উল্টো ঘোরার মানে হয় না, তাতে হাতিটার মুখোমুখি হয়ে

যাব। তাই দিক পাল্টে ছোটাছুটি অব্যাহত রাখলাম। নজর রাখছি প্রাকৃতিক পাঁচিলের উপর। একটুখানি ফাঁকা পেলেই ঢুকে যাব জঙ্গলের ভিতরে।

দিক পাল্টানোয় একটুখানি সুবিধে পেলাম। আমার মত দ্রুত ঘুরতে পারল না হাতি, তাই কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পারলাম দূরত্ব। তবে একটুও ফাঁকা দেখতে পেলাম না কোথাও। সবুজ বনানী দুর্ভেদ্য দেয়ালের মত পথরুদ্ধ করে রেখেছে আমাকে। ময়দানের কিনার ঘেঁষে ছুটছি আমরা, ধীরে ধীরে ব্যবধান কমিয়ে আনতে শুরু করল হাতি। চকিতের জন্য পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, ছ'ফুটের মধ্যে এসে গেছে প্রাণীটা। কেঁপে উঠলাম ওটার বৃংহতি শুনে, শুঁড়ের ফুটো দিয়ে আসা গরম বাতাস বয়ে গেল গায়ের উপর দিয়ে। ভয়ে সারা শরীর কেঁপে উঠল আমার।

ময়দানের তিন ভাগ পেরিয়ে এসেছি ততক্ষণে। পঞ্চাশ গজ সামনে মরা গাছটা দেখতে পেলাম, যেটার গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল দৈত্যটা। জানপ্রাণ দিয়ে ওদিকে ছুটলাম, গাছটাই আমার নিরাপত্তার শেষ ভরসা। কাছাকাছি গিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম, গাছের কাণ্ড ধরে চরকির মত ঘুরলাম, মুখোমুখি হলাম হাতির। ইচ্ছে ছিল গুলি করব ওটাকে, কিন্তু সময় পেলাম না। রাইফেল কক করতে করতেই আমার কাছে চলে এল ওটা। পিছাতে লাগলাম সভয়ে, বুনো ষাঁড়ের মত গাছের গায়ে মাথা দিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল হাতিটা।

মড়াৎ করে শুকনো কাঠির মত মাটি থেকে তিনহাত উপরে ভেঙে গেল মরা গাছ, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল। ওটার কাছ থেকে একটু দূরে সরে এসেছি বলে গায়ের উপর পড়ল না, তবে একটা ডাল ভীষণ জোরে আঘাত করল আমার বুকে। চিৎ হয়ে

পড়ে গেলাম, আর হাতিটা এগিয়ে এল আমার দিকে।

স্রেফ প্রবৃত্তির বশে তুলে আনলাম রাইফেল, কোনও কিছু না ভেবে টিপে দিলাম ট্রিগার। ব্যারেলের সামনে সাদা আলো চোখে পড়ল কেবল, আর কিছু না। পরে জেনেছি যে, হাতির বুকে লেগেছিল গুলিটা। যা হোক, শোয়া অবস্থায় ফায়ার করেছি, রাইফেলের পজিশন ঠিকমত ছিল না, তাই রিকয়েলের ফলাফল মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। হাত কেঁপে উঠল ভীষণভাবে, গদার মত রাইফেলের বাট আঘাত করল আমার ঘাড় আর কাঁধের সংযোগস্থলে। ব্যথায় অবশ হয়ে গেল দেহ, হাত থেকে খসে পড়ল রাইফেল। অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখলাম হাতিটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। নিশ্চিত এবং ভয়াবহ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার রইল না। একচুল নড়তে পারছি না আমি।

এরপর ঘটল অবাক ঘটনা। কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে গেল হাতিটা। শুঁড় তুলে ডাক ছাড়ল একটা। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মাটিতে। প্রায় একই সময়ে আমিও জ্ঞান হারালাম। কী ঘটল, তা আর দেখতে পেলাম না।

অনেকক্ষণ পর চেতনা ফিরে এল। আকাশের চাঁদের অবস্থান দেখে বুঝলাম, অন্তত দু'ঘণ্টা বেহুঁশ হয়ে ছিলাম। শিশিরে সারা গা ভিজে গেছে, ঠকঠক করে কাঁপছি শীতে। কোথায় আছি, মনে করতে পারলাম না প্রথমে। কিন্তু মাথা তুলে কালচে অবয়বটা দেখতেই ফিরে এল স্মৃতিশক্তি। আমার কাছ থেকে পঁচিশ কদম দূরে নিথর হয়ে পড়ে আছে এক-দাঁতঅলা হাতিটা।

ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে চক্কর দিয়ে উঠল

মাথা। মনে হলো আবার জ্ঞান হারাব। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ভাল বোধ করলাম কিছুটা। সুস্থতা ফিরে পাওয়ায় হাতিগুলোর কথা ভাবলাম। দুটোকে খতম করেছি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এক দাঁতঅলাটা? চাঁদের আলোয় হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখছি ওটাকে—মারা গেছে, নাকি বিশ্রাম নিচ্ছে?

হামাগুড়ির ভঙ্গিতে উঁচু হলাম একটু। মাটি হাতড়ে আমার রাইফেল খুঁজে বের করলাম, সাবধানে লোড করলাম ব্যারেল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে কাছে গেলাম প্রাণীটার। এবার ওর চোখ দেখতে পাচ্ছি চাঁদের আলোয়—খোলা, কিন্তু দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আছে। আরেকটু কাছে গেলাম আমি, কিন্তু হাতির চোখের পাতা নড়ল না... নড়ল না বিশাল দেহটাও। শুঁড়, কান, লেজ... সবই স্থির হয়ে আছে। বুঝতে পারলাম, মারা গেছে প্রাণীটা।

রাইফেল নামালাম না, নিশ্চিত হবার জন্য কাছে গিয়ে লাথি দিলাম অতিকায় দেহটাতে। কোনও প্রতিক্রিয়া হয় কি না, লক্ষ রাখলাম। এক চুল নড়ল না প্রাণীটা। আর কোনও সন্দেহ নেই, সত্যিই মারা গেছে। আমার এলোমেলো গুলিবর্ষণে, নাকি গাছের সঙ্গে মাথার সংঘর্ষে মগজের রক্তক্ষরণে মরেছে, তা জানতে পারিনি আজও। কিন্তু যা-ই হোক, মারা গেছে ওটা। হাঁটু মুড়ে রাজকীয় এক ভঙ্গি নিয়েছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে। অদ্ভুত সে-ভঙ্গি। মৃত্যুর এমন শান্ত, সমাহিত আর গর্বিত রূপ আর কখনও দেখিনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম এই দৃশ্য। অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্রষ্টাকে, এখনও শ্বাস ফেলছি বলে। শরীর অবশ্য খারাপ লাগছে বেশ। বাকি দুটো হাতির মৃতদেহ

পরীক্ষা করার শক্তি বা আগ্রহ পেলাম না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে রওনা হলাম ক্যাম্পের দিকে। পথে আর কোনও বিপদ ঘটল না, একসময় নিরাপদে পৌঁছে গেলাম ওখানে। কুলিরা এখনও ঘুমিয়ে আছে, ওদেরকে আর জাগালাম না। ব্র্যাণ্ডি খেলাম, তারপর জামাকাপড় খুলে শুয়ে পড়লাম কম্বলমুড়ি দিয়ে। ঘুমিয়ে গেলাম নিমেষে।

যখন ঘুম ভাঙল, সূর্য উঠে গেছে। চোখ খোলার পর অস্বাভাবিক একটা অনুভূতি হলো। মনে হলো যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটেছে গতরাতের ঘটনা। কিন্তু মাথা ঘোরাবার চেষ্টা করতেই ফিরে এলাম বাস্তবে। ঘাড় আর মুখের একপাশ রাইফেলের বাটের আঘাতে আড়ষ্ট হয়ে আছে, নড়াচড়ার ফলে ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম। কয়েক মিনিট নিঃসাড়ে শুয়ে রইলাম ধাতস্থ হবার জন্য, এই ফাঁকে নজর বোলালাম আমার সঙ্গীদের অবস্থা দেখার জন্য।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। শুকনো কাঠ জড়ো করে ক্যাম্পের মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে কুলিরা। চাদরমুড়ি দিয়ে তার পাশে বসে আছে গোবো আর এক কুলি। আমি এখনও ঘুমিয়ে আছি ভেবে নিশ্চিন্তমনে কথা বলছে দু'জনে। কান পাতলাম ওরা কী বলে শোনার জন্য।

গোবোকে বলতে শুনলাম, হাতির পিছে তাড়া করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছে সে। মাকুমাজান দক্ষ শিকারী, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মাথায় সম্ভবত গোলমাল আছে। পাগল না হলে খামোকা কোনও শিকারের পিছনে এভাবে লেগে থাকে কেউ? বোঝাই তো যাচ্ছে, হাতিগুলোর নাগাল পাওয়া যাবে না। এত চেষ্টা করেও ওগুলোর ধারেকাছে ভিড়তে পারছে না ওরা,

নিশ্চয়ই জাদু-টাদু কাজ করছে এর মাঝে। মাকুমাজানের মাথা ঠিক নেই, চোখের সামনের এসব চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন না, তাই বলে তাঁর পাগলামিকে বাড়তে দেয়া যায় না। মন্ত্রপূত হাতি ধাওয়া করতে গিয়ে প্রাণ দেবে কেন ওরা? গোবো জানাল, আমার এ-পাগলামি থামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওর সঙ্গী একমত হলো। তারও ধারণা, মাকুমাজান অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছেন। জীবনসংশয়ী বিপদ দেখা দেবার আগেই একটা কিছু করা প্রয়োজন। পরে হয়তো দেরি হয়ে যাবে। ওয়াম্বের এই রাজ্য মোটেই পছন্দ নয় ওর, সবখানে অশুভ আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত নামলেই শুরু হয় তাদের উৎপাত। এই তো, কাল রাতেই ভয়াল এক মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল তারা। মনে হয়েছে গোলাগুলি চলছে কোথাও।

'আমিও শুনেছি তো!' বলল গোবো। 'নিশ্চয়ই ভূতের কারসাজি! ওফ্... পাগলা মালিককে কীভাবে যে বোঝাই...'

'গোবো!' জলদগম্ভীর স্বরে ডেকে উঠলাম। 'আবোল-তাবোল কথা বন্ধ করে আমাকে একটু কফি দেবে?'

চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল দুই কুলি। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ওদের কথাবার্তা কতটুকু শুনতে পেয়েছি, তা ভেবে শঙ্কিত। ও-ব্যাপারে টুঁ-শব্দও করলাম না আমি, ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। ধমকের সুরে বললাম, 'কী ব্যাপার, এখনও বসে আছ কেন? কথা কানে যায়নি?'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল গোবো আর ওর সঙ্গী। কফি নিয়ে এল আমার জন্য। একটু পর সকালের নাশতাও পরিবেশন করল। খাওয়াদাওয়া শেষে আরাম করে পাইপ ধরিয়েছি, এমন সময় দলবদ্ধভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়াল কুলিরা।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলাম ভুরু কুঁচকে।

'আপনার সঙ্গে জরুরি একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই, মাকুমাজ্রান,' কুলিদের প্রতিনিধি হিসেবে বলল গোবো।

'বলে ফেলো, আমি শুনছি।'

'হাতিগুলোর ব্যাপারে কিছু বলতে চাই, দয়া করে রাগ করবেন না।'

'এত ঘোরানো-প্যাঁচানোর দরকার নেই, গোবো। যা বলার সরাসরি বলো।'

'ওগুলোকে অশুভ আত্মা বলে ভাবছি আমরা। আর ধাওয়া করতে চাই না। দয়া করে ক্ষান্ত দিন, মালিক। ওদেরকে শিকার করা সম্ভব নয় কিছুতেই। তারচেয়ে চলুন ফিরে যাই।'

'এসব ফালতু প্যাঁচাল পাড়ার জন্য এসেছ সবাই মিলে?'

'আপনার কাছে ব্যাপারটা গুরুত্বহীন হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে নয়। যদি গোঁ ধরেন, তা হলে একাই যেতে হবে আপনাকে হাতিগুলোর পিছনে। আমরা আর এক পা-ও আগে বাড়ছি না।'

ওদেরকে একটু খেলানোর ইচ্ছে জাগল মনে। গতরাতে কী ঘটেছে, তা ফাঁস করলাম না। বরং যুক্তি দেখালাম, 'অযথা ভয় পাচ্ছ, গোবো। হাতিগুলোকে নাগালে পেলেই তোমাদের মিথ্যে আশঙ্কা কেটে যাবে। দেখবে কীভাবে ঘায়েল করি আমার রাইফেল দিয়ে। আর সেটা খুব শীঘ্রি ঘটবে। দূরে নেই ওরা। কাল রাতে আমি ওদের ডাক শুনেছি।'

'সেটা আমরাও শুনেছি, মালিক,' বলল গোবো। 'আরও শুনেছি গোলাগুলির আওয়াজ। এখানে কে গুলি করবে, বলুন তো? সবই শয়তানের কারসাজি... দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাস। এই

ভয়ানক দেশে আমরা আর থাকতে রাজি নই, মাকুমাজান।'

'ধ্যাত্তেরি! যত্তসব কুসংস্কার। শয়তানের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, রাইফেলের ভয় দেখাবে! মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখো, গোবো। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়?'

'অত-শত বুঝি না আমরা, মালিক। আমাদের সিদ্ধান্ত আপনাকে জানিয়েছি, ওটার নড়চড় হবে না।'

কাঁধ ঝাঁকালাম। 'বেশ, তোমরা যদি ভীরুর মত পিছিয়ে যেতে চাও, আমি তো আর জোর খাটাতে পারব না। কিন্তু একটা অনুরোধ করব। এসো, চুক্তি করি। একঘণ্টার জন্য হাতির পিছু নিতে দাও আমাকে। এর মধ্যে যদি ওদের দেখা না মেলে, আর কিচ্ছু বলব না তোমাদেরকে। শিকারের ধান্দা বাদ দিয়ে সোজা চলে যাব মাটুকুদের সর্দার ওয়াম্বের কাছে। তাকে ভেট দেব। কী বলো?'

নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল কুলিরা। বলা বাহুল্য, খানিকক্ষণ পর রাজি হয়ে গেল আমার প্রস্তাবে। হবে না-ই বা কেন? রাইফেল দেখাচ্ছি না ওদেরকে, সেটাই সবচেয়ে বড় স্বস্তি ওদের জন্য।

ক্যাম্প গুটিয়ে আধঘণ্টা পরই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। শারীরিক ব্যথা-বেদনার পরও অদ্ভুত এক ফুরফুরে ভাব অনুভব করছি আমি। স্বাভাবিক, গতরাতে একাকী শিকার করেছি আফ্রিকার সবচেয়ে বড় তিনটে হাতিকে। মাত্র তিনটে বুলেট খরচ হয়েছে এতে। শিকারী হিসেবে এমন সাফল্য আর কেউ কখনও পেয়েছে বলে জানা নেই আমার। গর্বে বুক ফুলে উঠেছে কয়েকগুণ। ভয় পাচ্ছি শুধু একটা কথা ভেবে—এ-কাহিনি যখন কাউকে আমি শোনাব, হয়তো সে বিশ্বাস করবে না এক বর্ণও।

ভাববে বাড়িয়ে বলছি। রাতের আঁধারে একাকী কারও পক্ষে কি তিনটে হাতি শিকার করা সম্ভব?*

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে এগোলাম আমরা। যেখানে সিংহ দেখেছিলাম, সেই খোলা জায়গাটা পেরুলাম। একটু পর পৌঁছে গেলাম দ্বিতীয়টার কাছে। ওখানে ঢোকার আগে নাটকীয়তার আশ্রয় নিলাম আমি। ফিসফিসিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম, সবাইকে সতর্ক করে দিলাম শব্দ না করার জন্য। এমন আচরণ করছি, যেন হাতিগুলো খুব কাছেই আছে, যে-কোনও মুহূর্তে হামলা চালিয়ে বসতে পারে। একসারিতে দাঁড় করালাম সবাইকে। গোবোকে পাঠালাম সামনে, গাইড হিসেবে; ওর পিছনে থাকলাম আমি।

'ঠিক আছে, এগোও।' বললাম ফিসফিসিয়ে।

পা টিপে টিপে সামনে বাড়ল গোবো। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে খোলা ময়দানে পা রাখল। থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অস্থির ভঙ্গিতে ওকে আঙুল মটকাতে দেখলাম।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলাম পিছন থেকে।

'হাতিটাকে দেখতে পাচ্ছি, মালিক,' বলল ও। 'এক-দাঁতঅলা বিশাল হাতিটা... হাঁটু মুড়ে বসে আছে।'

ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম,

পাঠকদের মধ্যে যাদের কাছে সত্যিই আজগুবি মনে হচ্ছে এ-কাহিনি, তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এই সম্পাদক কিছুদিন আগে আরেক শিকারীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, যিনি পর পর চারটা গুলির সাহায্যে চারটা আফ্রিকান হাতিকে শিকার করেছিলেন। ওদের মধ্যে তিনটাকেই তিনি ঘায়েল করেছিলেন মাথায় গুলি করে। এর সাক্ষীও আছে। কাজেই মি. কোয়াটারমেইনের গল্পকে অবাস্তব ভাবা ঠিক হবে না—সম্পাদক।

সেভাবেই রয়েছে হাতিটা। আশপাশে চোখ বোলালাম। অন্যদুটোর মৃতদেহও দেখতে পেলাম পরিষ্কারভাবে।

থতমত খেয়ে যাওয়া কুলি-সর্দারের দিকে ফিরলাম। 'কী মনে হয়, গোবো? ওরা কি ঘুমাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, মাকুমাজান। ওরা ঘুমাচ্ছে।'

'না, গোবো। ওরা মারা গেছে।'

'মারা গেছে!' চমকে উঠল গোবো। 'কীভাবে মারা গেছে? কে মেরেছে ওদেরকে?'

'আমাকে লোকে কী বলে ডাকে, গোবো?'

'মাকুমাজান বলে, মালিক।'

'মাকুমাজান মানে কী?'

'মাকুমাজান মানে সদা-জাগ্রত, মালিক। যে-মানুষ রাতেও ঘুমায় না।'

'হ্যাঁ, গোবো। আমি সেই মানুষ। ভীরু গাধার দল, কাল রাতে তোমরা যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলে, আমি তখন একাকী বেরিয়ে পড়েছিলাম রাইফেল নিয়ে। চাঁদের আলোয় ঘায়েল করেছি হাতিগুলোকে। একটা করে গুলি উপহার দিয়েছি ওদের প্রত্যেককে... মাত্র একটা। তাতেই মারা পড়েছে ওরা। আমার রাইফেলের আওয়াজই ঘুমের মধ্যে শুনেছ তোমরা। বিশ্বাস হচ্ছে না? মাটির দিকে তাকাও। আমার পায়ের ছাপ দেখতে পাবে। দেখবে, কীভাবে আমাকে তাড়া করেছিল ওরা... কীভাবে সেই বিপদ কাটিয়ে শিকার করেছি ওদেরকে। কাপুরুষ তোমরা, শিকারকে এত কাছে পেয়েও ফিরে যেতে চাইছিলে। তোমাদের আশায় বসে থাকলে কিছুতেই আর সফল হতাম না আমি।'

মুখের ভাষা হারাল কুলিরা। চরম অবিশ্বাসে আমার মুখ আর

মরা হাতিগুলোর দিকে তাকাল পালা করে। তারপরই একযোগে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। হুড়োহুড়ি করে সবাই ছুটে গেল লাশগুলো দেখতে। অনুভব করল আমার কৃতিত্ব। খানিক পরে যখন আমার দিকে ফিরল, সবার চোখে অদ্ভুত এক শ্রদ্ধা ফুটে উঠতে দেখলাম।

এই ঘটনার পর কুলিদের নিয়ে আর কখনও ঝামেলা পোহাতে হয়নি। আমাকে দেবতার আসনে বসিয়ে দিয়েছিল ওরা। স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল ওদের মনে—যার পক্ষে রাতের আঁধারে অমন ভয়ঙ্কর তিনটা প্রাণী শিকার করা সম্ভব, সে কিছুতেই মরণশীল মানুষ হতে পারে না। আমার উপর এমনই আস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ওদের যে, বললে সম্ভবত মৃত্যুর মুখেও ঝাঁপ দিত বিনা-প্রশ্নে।

যা হোক, হৈ-হুল্লোড় শেষ হলে এগিয়ে গিয়ে লাশগুলো পরীক্ষা করলাম। অমন সুন্দর আইভরি আমি আর কোনোদিন দেখিনি, দেখব বলে মনেও হয় না। সারাদিন লেগে গেল দাঁতগুলো কাটতে। ডেলাগোয়া বে'তে যখন পৌঁছুল... আমার তত্ত্বাবধানে নয় অবশ্য... ওজন করে দেখা গেল, সবচেয়ে বড় দাঁতটা একশো ষাট পাউণ্ড ভারী।[*] বাকি চারটা দাঁতের ওজন দাঁড়াল গড়ে একশো পাউণ্ডের মত। সবমিলিয়ে প্রচুর আইভরি। কপাল খারাপ যে, বড় দাঁতটা কেটে দু'টুকরো করে ফেলতে হয়েছিল, নইলে ওটা বয়ে আনার উপায় ছিল না। আস্ত রাখতে পারলে একটা দেখার মত বস্তু হতো।

---

[*] *আমার দেখা সবচেয়ে বড় আইভরির ওজন দেড়শো পাউণ্ড—সম্পাদক।*

'কোয়াটারমেইন, আপনি একটা বর্বর!' কাহিনির এ-পর্যায়ে বলে উঠলেন সার হেনরি কার্টিস। 'কীভাবে পারলেন অমন একটা দাঁতকে কেটে দু'টুকরো করতে! আমি হলে কিছুতেই অমন কাজ করতাম না, দরকার হলে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতাম ওটা ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত।'

মুচকি হাসলেন কোয়াটারমেইন। 'বলা সহজ, করা কঠিন। আমার জায়গায় থাকলে বুঝতেন, অবস্থাটা কী। বিশেষ করে ওই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে যে-পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম, তাতে অন্য কেউ হলে দাঁত-টাঁত সব ফেলে দিয়ে জান নিয়ে ভাগত।'

'অ!' বললেন ক্যাপ্টেন গুড। 'আপনার গল্প শেষ হয়নি তা হলে? অবশ্য... যদ্দূর বলেছেন, মন্দ বলেননি। এরচেয়ে ভাল গল্প বানানো আমার পক্ষেও সম্ভব নয়।'

বিরক্ত হয়ে ওঁর দিকে তাকালেন কোয়াটারমেইন। তাঁর কাহিনি নিয়ে কেউ ঠাট্টা-মশকরা করুক, তা পছন্দ করেন না একদম।

'কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না, গুড,' থমথমে গলায় বললেন তিনি। 'সত্যিকার একটা রোমাঞ্চকর অভিযানের সঙ্গে আপনার ওই শিং আটকে ঝুলতে থাকা ছাগলের গল্পের তুলনা করার মানেটা কী? আর... না, আমার কাহিনি এখনও শেষ হয়নি। উত্তেজনাকর আসল অংশটা শুনবেন এর পরেই। কিন্তু আজ রাতের মত যথেষ্ট হয়েছে গালগল্প। বাকিটা নাহয় কাল বলা যাবে। আর গুড... আপনি যদি এমন হেলাফেলা করতে থাকেন, তা হলে এই কাহিনির শেষটা আর শুনতে পাবেন না কোনোদিনই।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন ক্যাপ্টেন গুড। 'দুঃখিত, আমি

আসলে আপনাকে অপমান করতে চাইনি। আর এমনটা হবে না, কথা দিচ্ছি। আসুন, যাবার আগে রাগ ঝেড়ে ফেলে একটু ড্রিঙ্ক করি।'

মদের গ্লাস ঠোঁটে ছোঁয়ালাম আমরা।

পাঁচ

মাইওয়ার বার্তা

পরদিন সন্ধ্যায় আবার মিলিত হলাম আমরা। একসঙ্গে ডিনার সারার পর আগের দিনের গল্পের খেই ধরলেন মি. কোয়াটারমেইন। তবে এর জন্য প্রচুর পীড়াপীড়ি করতে হলো। ক্যাপ্টেন গুডের প্রতি ক্ষোভ তখনও মেটেনি তাঁর।

সবাই মিলে কথা দিলাম, আর কোনও ধরনের ঠাট্টা-মশকরা করা হবে না তাঁর গল্প নিয়ে। এরপরেই সন্তুষ্ট হলেন তিনি। পাঠকদের জন্য গল্পের বাকি অংশও কোয়াটারমেইনের জবানিতে তুলে দিচ্ছি নীচে।

সারাদিন লেগে গেল হাতির দাঁত আলাদা করতে, সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ আগে শেষ হলো কাজ। এর মাঝে একবার শুধু খাওয়ার বিরতি নিয়েছি আমরা, বাকি পুরোটা সময় খেটেছি যন্ত্রের মত।

মাটিতে সাজিয়ে রাখা পাঁচটা আইভরির দিকে তাকিয়ে মন ভরে গেল। অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করলাম দেহ-মনে।

খাবারটাও হয়েছে স্মরণীয়। এক-দাঁতঅলা হাতিটার হৃৎপিণ্ড দিয়ে পেটপুজো করেছি আমরা। ফালি ফালি করে চর্বিতে ভেজে খেয়েছি ওটা সবাই মিলে। হৃৎপিণ্ডটা এত বড় যে, একুশজন মিলেও পুরোপুরি শেষ করতে পারিনি। খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু লেগেছে।

দাঁত আলাদা করা হলে হাতিটার চোয়াল পরীক্ষা করলাম আমি। জানার চেষ্টা করলাম, আরেকটা দাঁত নেই কেন। একটু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, দ্বিতীয় দাঁতটা কোথাও ভেঙে-টেঙে যায়নি; আসলে ওঠেইনি ওটা কোনোকালে।

যা হোক, পাঁচটা দাঁত পেয়েছি, তা-ই বা কম কীসে? গোবো-সহ দু'জনকে লাগিয়ে দিলাম বড় আইভরিটা কেটে দু'টুকরো করতে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে দিয়েছি নির্দেশটা, যুক্তির কাছে হার মেনে। এর আগে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, কোনোক্রমেই ওটা আস্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একশো ষাট পাউণ্ড ওজন... যা-তা কথা নয়।

পাইপ ধরিয়ে বিষণ্ন মনে ওদের কাজ দেখছি, হঠাৎ নড়ে উঠল কাছের একটা ঝোপ। কয়েক মুহূর্ত পর ওটার পিছন থেকে বেরিয়ে এল স্থানীয় এক মেয়ে। বছর বিশেক বয়স, দেখতে ভারি সুন্দরী, হাবভাবে এক ধরনের আভিজাত্য আছে। মাথার উপর একটা ঝুড়ি, তাতে কাঁচা ভুট্টা।

একটু অবাক হলাম মেয়েটাকে দেখতে পেয়ে। ধারেকাছে কোনও গ্রাম নেই; যেখান থেকেই আসুক, বহুদূর থেকে আসতে হয়েছে ওকে। চেহারায় অবশ্য বিস্ময় ফুটতে দিলাম না।

একজন কুলিকে ডেকে দামদস্তুর করতে বললাম মেয়েটার সঙ্গে—ভুট্টাগুলো কিনতে চাই আমি।

নির্দেশটা দিয়েই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লাম দাঁত কাটার তদারকিতে। একটু পর আমার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। আমার কুলির সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়নি, যা বলার তা আমাকেই নাকি বলবে।

'মারেমি! মারেমি!!' বলে উঠল মেয়েটা। দু'হাত একত্র করে মৃদু তালি দিল।

সম্ভাষণটার সঙ্গে পরিচিত আমি। সম্মান দেখানো হচ্ছে আমাকে। এভাবে মৃদু তালি দিয়ে *বাসুটু* জাতির আদিবাসীরা সম্ভাষণ জানায় অতিথিকে। মাটুকুরাও একই রীতি অনুসরণ করে বলে শুনেছি।

'কী ব্যাপার, মেয়ে?' সিসুটু ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ভুট্টা বিক্রি করতে এসেছ?'

'না, মহান সাদা শিকারী,' বলল সে। 'এগুলো আমি তোমার জন্য উপহার হিসেবে এনেছি।'

'খুব ভাল। নামিয়ে রাখো তা হলে।'

নড়ল না মেয়েটা। 'উপহারের বদলে উপহার চাই আমি, সাদা মানুষ।'

'হুম,' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'বিনিময়-প্রথায় বিশ্বাস তোমার? কী চাও? শস্যদানা হলে চলবে?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

পাশ ফিরে এক কুলিকে বললাম আমার ব্যাগ থেকে শস্যদানা নিয়ে আসতে।

'উপহার-দানকারীর হাত থেকে উপহার নিতে পারলে

সে-উপহারের মূল্য বেড়ে যায়,' অর্থপূর্ণ সুরে বলল মেয়েটা।

'তারমানে আমাকে নিজ হাতে দিতে হবে ওগুলো?'

'অবশ্যই!'

উঠে দাঁড়ালাম। 'ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে।' হাঁটতে হাঁটতে সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'জুলুদের ভাষা এত চমৎকারভাবে বলতে শিখেছ কোথায়, মাটুকু মেয়ে?'

'আমি মাটুকু নই,' বলল মেয়েটা। 'সর্দার নালার গোত্রের মেয়ে আমি। বুটিয়ানা গোত্র। ওই যে... ওখানে থাকে আমার লোকেরা।' আঙুল তুলে দূরের পাহাড় দেখাল। 'আরেকটা পরিচয় আছে আমার... সর্দার ওয়াম্বের বউদের একজন আমি।'

খেয়াল করলাম, মাটুকু সর্দারের নাম উচ্চারণের সময় জ্বলে উঠেছে ওর দু'চোখ।

'এখানে এসেছ কীভাবে?'

'হেঁটে,' সংক্ষেপে বলল মেয়েটা।

ব্যাগের কাছে পৌঁছে গেছি। বাঁধন খুলে একমুঠো শস্যদানা বের করে দিলাম।

'তোমার উপহার পেয়েছ,' বললাম আমি। 'এবার আমারগুলো দাও।'

আমার হাত থেকে শস্যদানা নেবার সময় একবার তাকিয়েও দেখল না মেয়েটা। ওগুলো গুঁজে রাখল কোমরে, তারপর মাথা থেকে ঝুড়ি নামিয়ে ভুট্টাগুলো ঢেলে দিল মাটিতে।

ঝুড়ির তলায় অদ্ভুত আকৃতির কয়েকটা সবুজ পাতা দেখতে পেলাম। দেখতে অনেকটা *গুটেপাচা* গাছের পাতার মত, তবে অনেক বেশি পুরু আর শক্ত। আমার আগ্রহ লক্ষ করে একটা পাতা তুলে নিল মেয়েটা, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল। তারপর

বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে।

বিজাতীয় কোনও রীতি বোধহয়, আমাকেও একইভাবে পাতা শুঁকতে হবে, এই ভেবে হাতে নিলাম পাতাটা। কিন্তু নাকের কাছে নিতে গিয়ে থমকে গেলাম। পাতার গায়ে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু দাগ দেখতে পেয়েছি।

'আহ্!' ফিসফিসিয়ে বলল মেয়েটা। 'চিহ্নগুলো পড়ো, সাদা মানুষ!'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম পাতাটা। চোখা কোনও জিনিস দিয়ে দাগ কাটা হয়েছে ওটার গায়ে। সবুজ আবরণ কেটে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে লালচে রস, আর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে ইংরেজিতে লেখা একটা চিঠি। অবিশ্বাস্য!

পড়তে শুরু করলাম চিঠিটা:

মাটুকুদের দেশে একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ শিকারে এসেছেন বলে খবর পেয়েছি। তাই তড়িঘড়ি করে লিখছি এ-চিঠি। আপনি যে-ই হয়ে থাকুন না কেন, যত দ্রুত পারেন বুটিয়ানাদের এলাকায় পালিয়ে যান, আশ্রয় নিন সর্দার নালার কাছে। ভেট দেবার আগেই শিকার শুরু করেছেন বলে সর্দার ওয়াম্বে খেপে গেছে ভীষণ, একদল যোদ্ধাকে পাঠাচ্ছে দেখামাত্র আপনাকে হত্যা করবার জন্য। জীবন বাঁচান নিজের! ঈশ্বরের দোহাই, পারলে সাহায্য করুন আমাকেও। গত সাত বছর থেকে আমি ওই শয়তান ওয়াম্বের হাতে বন্দি হয়ে আছি, জীবন কাটাচ্ছি ক্রীতদাসের মত। আমার সঙ্গী-সাথীদের সবাইকে খুন করেছে ও, আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে স্রেফ

কামারের কাজ জানি বলে। ওর বউ মাইওয়া একটা-ফন্দি এঁটেছে... সর্দার নালা, মানে ওর বাবার কাছে যাবে সে, রাজি করাবে ওয়াম্বের উপর হামলা করার জন্য। মাইওয়ার সন্তানকে খুন করেছে ওয়াম্বে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য বুটিয়ানাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে সে। পারলে আপনিও আসুন, উদ্ধার করুন আমাকে। এই কষ্ট বৃথা যাবে না, ওয়াম্বের পুরো বাড়ি খাঁটি আইভরি দিয়ে তৈরি। ওগুলো বিক্রি করে প্রচুর টাকা পাবেন আপনি। দোহাই লাগে, আমাকে এখানে ফেলে যাবেন না। তা হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না আমার।

ইতি,
জন এভারি।

থমকে গেলাম এই চিঠি পড়ে। জন এভারি... আমার পুরনো বন্ধু... এখনও বেঁচে আছে!

পাতার অন্যপাশটার দিকে ইশারা করল মেয়েটা। তাড়াতাড়ি উল্টে দেখলাম। আরও কিছু কথা লেখা ওখানে।

পুনশ্চঃ এইমাত্র জানতে পারলাম, যে-শিকারী এই এলাকায় এসেছে, তাকে লোকে মাকুমাজান বলে ডাকে। তারমানে সে আমার বন্ধু অ্যালান কোয়াটারমেইন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ও-ই যেন হয়। ও হলে আমার আশা আছে। কোয়াটারমেইন কোনোদিন আমাকে এই গাড্ডায় ফেলে রেখে চলে

যাবে না। মরতে ভয় পাই না আমি, কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে ওয়াম্বের একটা কিছু করে যেতে চাই।

'না, বন্ধু,' বিড়বিড় করলাম আপনমনে। 'তোমাকে কখনোই ফেলে যাব না... উদ্ধার করব যেভাবেই পারি। বিপদ-আপদ কম মোকাবেলা করিনি জীবনে। দু'একটা কৌশল এখনও আমার আস্তিনে লুকানো আছে। শুধু জুতসই একটা পরিকল্পনা চাই আমার।'

মেয়েটার দিকে ফিরলাম। 'তোমার নাম মাইওয়া?'

'হ্যাঁ, সাদা মানুষ।'

'ওয়াম্বের বউ তুমি, আর নালার মেয়ে?'

'ঠিক।'

'বাবার কাছে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন যাচ্ছ, জানতে পারি? দাঁড়াও, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।'

গোবোকে ডেকে হুকুম দিলাম লোকজনকে তৈরি করার জন্য। যত দ্রুত সম্ভব রওনা হতে চাই।

কোমরে হরিণের চামড়ার একটা থলে বেঁধে রেখেছে মাইওয়া। আমার কথা শেষ হতেই ওটার মুখ খুলে হাত ঢুকিয়ে দিল, যে-জিনিসটা বের করে আনল, তা দেখে আমার দমবন্ধ হবার জোগাড় : ছোট্ট এক শিশুর হাত... কবজির উপর থেকে কাটা, রোদে শুকিয়ে মমি করে নেয়া হয়েছে।

'এর জন্য যাচ্ছি আমি,' থমথমে গলায় বলল মাইওয়া, 'আমার বাচ্চার জন্য। একটাই বাচ্চা হয়েছিল আমার... ওয়াম্বে

তার বাবা। আঠারো মাস বেঁচেছে আমার বুকের ধন, ওকে পাগলের মত ভালবেসেছি আমি। তারপরেই বাচ্চাটাকে খুন করেছে ওয়াম্বে। ওর ভয় ছিল, এই বাচ্চা বড় হয়ে ওর রাজত্ব দখল করে নেবে। এভাবে আরও অনেক বাচ্চাকেই মেরেছে শয়তানটা, ওর ঘরে আজ পর্যন্ত একটা সন্তানও টিকতে পারেনি। আমি কেঁদেছি, ওর পায়ে পড়েছি... কিন্তু কিছুতেই ঠেকাতে পারিনি আমার বাচ্চার মৃত্যু!'

'কীভাবে ঘটল ঘটনাটা?' জানতে চাইলাম শান্ত ভঙ্গিতে।

'একদিন বিকেলে বাড়ির বাইরে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে ছিলাম,' বলল মাইওয়া। 'কয়েকজন সৈনিক ওখান দিয়ে যাবার সময় সালাম ঠুকে বসল, ঠাট্টা করে বলল—ভবিষ্যতের সর্দারের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে। কথাটা কানে গেল ওয়াম্বের, রাগে পাগল হয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে...'

কাহিনির এ-পর্যায়ে থেমে গেলেন কোয়াটারমেইন। বললেন, 'আমাকে মাইওয়া তার বাচ্চার করুণ মৃত্যুর পুরো বর্ণনা দিয়েছে, কিন্তু সেটা আপনাদেরকে খুলে বলতে চাই না। অসহায় একটা শিশুকে যে-নৃশংসতার মাধ্যমে খুন করা হয়েছে, তা না শোনাই ভাল।'

একমত হলাম সবাই।

ক্যাপ্টেন গুড শুধু জানতে চাইলেন, 'বিস্তারিত বলার দরকার নেই, কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল বাচ্চাটাকে, তা জানতে পারি?'

'সিংহ মারার ফাঁদে ফেলে,' সংক্ষেপে জানালেন কোয়াটারমেইন।

এরপর আবার গল্পের খেই ধরলেন তিনি।

কাঁপা কাঁপা গলায় পুরো ঘটনা শোনাল মাইওয়া। শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। এমন বর্বরতার কথা কল্পনা করা যায় না। বিবেক-আত্মা... সব বিদ্রোহ করে উঠল অমানুষ ওয়াম্বের বিরুদ্ধে।

ওর কথা শেষ হলে জানতে চাইলাম, 'এখন তুমি কী করতে চাও, মাইওয়া?'

'কী করতে চাই?' শীতল গলায় বলল মাইওয়া। কণ্ঠে তীব্র আক্রোশ। 'আমি প্রতিশোধ নেব, সাদা মানুষ... ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ! যেভাবে আমার বাচ্চাকে খুন করেছে ওয়াম্বে, ঠিক সেভাবে কষ্ট দিয়ে ওকেও হত্যা করব। যতদিন না আমার এই শপথ পূরণ করতে পারছি, কিছুতেই হাল ছাড়ব না। চেষ্টা চালিয়ে যাব... ওয়াম্বেকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ছাড়ব আমি!'

'ভাল বলেছ।'

'শুধু বলা না, করেও দেখাব। মাকুমাজান, প্রতিশোধ নেয়াই এখন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই দেখো আমার বাচ্চার হাত। বেঁচে থাকতে এই হাত যেভাবে আমার সঙ্গে থাকত, মরার পরেও সেভাবে রেখেছি। প্রতি রাতে এই হাত এখনও আমার মুখ স্পর্শ করে... স্পর্শ করে আমার চুল। আমাকে সে-স্মৃতি ভুলতে দেয় না। হায় আমার বাচ্চা! দশদিন আগেও আমার বুকে জড়িয়ে রেখেছিলাম ওকে, অথচ আজ এই শুকনো হাত ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। না, এ-জ্বালা আমি আর সহ্য করব না।'

ফুঁপিয়ে উঠে হাতটা বুকের মধ্যে জাপটে ধরল মাইওয়া।

'আমার বন্ধুর কথা বলো,' নরম গলায় বললাম ওকে।

চোখ মুছে আমার দিকে তাকাল মাইওয়া। 'সাদা ওই কয়েদি বড় ভাল মানুষ। আমার বাচ্চাকে খুবই ভালবাসত, তাই আমিও খুব পছন্দ করতাম ওকে। ওয়াম্বের ওই জঘন্য কীর্তি দেখার পর ও-ও কেঁদে ফেলেছিল। তবে সে খুব বুদ্ধিমান। আমাকে একটা ফন্দি দিয়েছে। বলেছে—মাইওয়া, তোমাদের রীতি অনুসারে মৃতদেহ ছোঁয়ার পর জঙ্গলে গিয়ে শরীর আর মন পরিশুদ্ধ করার নিয়ম আছে। এই-ই সুযোগ তোমার জন্য। ওয়াম্বেকে গিয়ে বলো, পনেরো দিনের জন্য জঙ্গলে যেতে চাও তুমি, নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে। প্রস্তাবটায় রাজি হবে ও। গ্রাম ছেড়ে বেরুনোর পর সোজা চলে যেয়ো তোমার বাবার কাছে, তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করাবে মাটুকুদের উপর হামলা চালাবার জন্য। হাজার হোক, আপন নাতি খুন হয়েছে তার, খবরটা শুনলে সে-ও প্রতিশোধ নিতে চাইবে। তার প্রতিশোধের সঙ্গে তুমিও তোমার প্রতিশোধ নিতে পারবে ওয়াম্বের উপর।

'বুদ্ধিটা পছন্দ হলো আমার। সাদা কয়েদির কথামত আমার স্বামীর কাছে গিয়ে আর্জি জানালাম। বলা বাহুল্য, খুশিমনেই আমাকে গ্রাম ছেড়ে বেরুতে অনুমতি দিল সে। রওনা হবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় খবর পেলাম, এক সাদা শিকারীর আগমন ঘটেছে আমাদের এলাকায়। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ছিল তখন ওয়াম্বে, খবরটা শোনামাত্র রেগে বোম হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আদেশ দিল—একটা *ইম্পি*, মানে যোদ্ধাদল পাঠানো হোক। সাদা শিকারীকে খুন করে তার সমস্ত মালামাল লুঠ করে আনবে। খবরটা তাড়াতাড়ি জানালাম আমি সাদা কয়েদিকে। সে তখন গাছের পাতায় ওই চিঠি লিখে দিল, আমাকে বলল চিঠিটা

তোমার কাছে নিয়ে আসতে, যাতে ওর খবর পাও... একই সঙ্গে প্রাণ বাঁচাতে পারো নিজের। ওর কথামত কাজ করেছি আমি। বাবার কাছে যাবার আগে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। এই-ই আমার কাহিনি।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি। 'ওই ইম্পিতে কত যোদ্ধা আছে, বলতে পারো?'

'দেড়শোর মত।'

'এ-মুহূর্তে কোথায় আছে ওরা?'

'উত্তরে। তোমার নিশানা দেখে অনুসরণ করছে। গতকাল ওদেরকে পিছনে ফেলে এসেছি আমি। মনে হচ্ছিল এদিকে এলে পাওয়া যাবে তোমাকে, তাই পায়ের ছাপ অনুসরণ না করে একটা সংক্ষিপ্ত পথে চলে এসেছি। কপাল ভাল, অন্য কোথাও যাওনি তুমি। কিন্তু যোদ্ধারা কাল ভোরে এখানে পৌঁছে যাবে।'

'সম্ভাবনা আছে,' স্বীকার করলাম। তার আগেই সরে যেতে হবে আমাকে। দুষ্ট একটা বুদ্ধি খেলল মাথায়—হাতির লাশে স্ট্রিকনিন মাখিয়ে যেতে পারি। এতগুলো মানুষ... খাবারদাবার ঠিকমত পাচ্ছে না নিশ্চয়ই। তিন-তিনটা হাতি মরে পড়ে আছে দেখলে থামবে নির্ঘাত। মাংস খাবে। বিষ মাখিয়ে রাখতে পারলে খতম করে দেয়া যাবে ওদেরকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা করা হলো না। সঙ্গে যথেষ্ট স্ট্রিকনিন নেই।

কোয়াটারমেইনকে থামিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন সার হেনরি কার্টিস। বললেন, 'সত্যি কথা বলুন, কোয়াটারমেইন। আসলেই স্ট্রিকনিন ছিল না, নাকি অমন নীচ কৌশল অবলম্বন করতে বিবেকের সায় পাননি?'

'বললাম তো স্ট্রিকনিন ছিল না,' গোমড়ামুখে বললেন কোয়াটারমেইন। 'অত বড় তিনটা হাতির গায়ে মাখানোর জন্য কত স্ট্রিকনিন দরকার, তা আন্দাজ করতে পারেন?'

আর উচ্চবাচ্য করল না কেউ। কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, সার কার্টিসের ধারণাই ঠিক। অতগুলো মানুষকে বিষ খাওয়ানোর ইচ্ছে হয়নি মি. কোয়াটারমেইনের। যত যা-ই হোক, তিনি একজন নীতিপরায়ণ মানুষ... সাহসী। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে সামনাসামনি হত্যা করতে দ্বিধা করবেন না, কিন্তু কাপুরুষের মত বিষ খাওয়ানো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

যা হোক, গল্প বলে চললেন তিনি।

মাইওয়ার সঙ্গে কথা শেষ হতেই গোবো হাজির হলো। জানাল, কুলিরা যাত্রার জন্য তৈরি।

'খুব ভাল,' বললাম আমি। 'চলো রওনা হই। মস্ত বিপদে আছি আমরা সবাই। ওয়াম্বে একদল যোদ্ধা পাঠিয়েছে আমাদেরকে খুন করবার জন্য। খুব শীঘ্রি এখানে পৌঁছে যাবে ওরা।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল গোবোর। কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেল শরীরে। ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আমি তো সতর্ক করেছি আপনাকে, মাকুমাজান, ওয়াম্বের দেশে মৃত্যু ঘুরে বেড়ায়।'

'ঘুরে বেড়াক, কোনও ক্ষতি নেই,' হালকা গলায় বললাম আমি। 'আমাদেরকে শুধু ওর চেয়ে একটু দ্রুত হাঁটতে হবে, এ-ই আর কী।'

'দ্রুত এগোতে চাইলে দাঁতগুলো ফেলে যেতে হবে,

মাকুমাজান।'

'উঁহুঁ। এখুনি ওগুলো হাতছাড়া করার ইচ্ছে নেই আমার। পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেলে নাহয় ভেবে দেখা যাবে। আপাতত সঙ্গে নাও ওগুলো।'

তর্কে গেল না গোবো। সঙ্গীদেরকে নির্দেশ দিল সমস্ত বোঝা পিঠে তুলে নিতে। তারপর জানতে চাইল কোন্‌দিকে যেতে হবে।

'কোন্‌দিকে, মাইওয়া?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওই যে... ওদিকে,' হাত তুলে পর্বতমালার বাহু দেখাল মাইওয়া, যেটা বুটিয়ানা আর মাটুকুদের সীমানা আলাদা করেছে। 'ওখানে, ছোট চূড়াটার নীচে একটা পথ আছে, সেখান দিয়ে মানুষ যেতে পারে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যাবার ওটাই একমাত্র রাস্তা। যদি বন্ধ করে দেয়া যায়, পাশ ঘুরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সেটা পুরো দুই-আড়াই দিনের পথ।'

'পাহাড়টা কতদূর?'

'আজকের রাত আর আগামীকাল সারাদিন যদি হাঁটো, তা হলে সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছুতে পারবে।'

হিসেব করে ফেললাম—চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল হাঁটতে হবে একটানা। কাজটা সহজ হবে না।

কুলিদেরকে বললাম রান্না করা হাতির মাংস যদ্দূর সম্ভব সঙ্গে নিয়ে নিতে। আমিও নিলাম কিছুটা। রওনা হবার আগে মাইওয়াকে জোর করে খাওয়ালাম কিছুটা। মেয়েটা প্রতিশোধের নেশায় নাওয়া-খাওয়া, বিশ্রাম, সব ছেড়ে দিয়েছে। রীতিমত জোর-জবরদস্তি করতে হলো ওকে খাওয়াতে। ঠেকায় পড়েই করলাম সেটা। এই মেয়ে আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা। অসুস্থ

হয়ে পড়লে ওর চেয়ে আমরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব।

যা হোক, একটু পর ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হলাম আমরা। মাইওয়া পথ দেখাচ্ছে। ঢালু জমি ধরে আধঘণ্টা যাবার পর নিচু একটা এলাকায় পৌঁছুলাম। দেখে মনে হলো শুকনো কোনও জলাশয়ের তলা। পুরোটা এখন ছেয়ে গেছে বুনো ঝোপঝাড়ে। মাঝেমধ্যে একটা দুটো ফাঁকা জায়গা আছে, তবে খুব বেশি নয়।

ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগোলাম আমরা। কোনও পথ নেই ওখানে, ডালপালা কেটে এগোনোর জায়গা করে নিতে হচ্ছে। যেন অনন্তকাল চলার পর পৌঁছুলাম ওটার শেষ প্রান্তে, ঢাল বেয়ে আবার উঠতে শুরু করলাম।

ঢালের মাথায় পৌঁছে থেমে গেল মাইওয়া। চোখের উপর হাত তুলে তাকাল পিছনদিকে। একটু পর আমার বাহু স্পর্শ করল ও, ওদিকে তাকাবার জন্য ইশারা করল।

ফেলে আসা সাগর-সদৃশ জঙ্গলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। ছ'সাত মাইল দূরে একটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে হঠাৎ কী যেন ডুবন্ত সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল। একবার... দু'বার... তিনবার!

'কী ওগুলো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ওয়াম্বের যোদ্ধাদের বর্শা,' উত্তর দিল মাইওয়া। 'ওরা খুব দ্রুত এগোয়।' আশ্চর্যরকম শান্ত ওর কণ্ঠস্বর।

আঁতকে উঠলাম কথাটা শুনে। কী সর্বনাশ, ওরা তো খুব কাছে চলে এসেছে!

'ভয় পেয়ো না,' আমার চেহারা দেখে বলল মাইওয়া। 'আপাতত আর এগোবে না ওরা। হাতির মাংস খাওয়ার জন্য

থামবে। বিশ্রাম নেবে। সুযোগটা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। হয়তো ফাঁকি দিতে পারব ওদের।'

আর কোনও কথা না বলে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সূর্য পুরোপুরি ডোবার পর কিছুটা সময়ের জন্য থামতে হলো। চারপাশ এত অন্ধকার হয়ে গেছে যে, পথঘাট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এতে সময় নষ্ট হলো বেশ কিছুটা, তবে জিরিয়ে নিতে পারলাম সবাই। চাঁদ ওঠার পর ফের শুরু করলাম যাত্রা। ভাগ্য ভাল যে ওয়াম্বের যোদ্ধাদের বর্শার ঝলকানি কুলিদের কেউ দেখতে পায়নি। সেক্ষেত্রে ওদেরকে সামলানো কঠিন হয়ে যেত। কীরকম ভয় পাচ্ছে ওরা, তা বোঝা যাচ্ছে হাবভাব থেকেই। পিঠে ভারী বোঝা থাকার পরও বেশ দ্রুত হাঁটছে, কোনও কুলিকে এত জোরে এগোতে দেখিনি আমি। সতর্কতার জন্য সবার পিছনে থাকছি আমি। ভয়ের মুখে সমস্ত মালামাল ফেলে পিঠটান দিক ওরা, তা চাই না। বিশেষ করে দামি আইভরিগুলো কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

রাতভর এগোলাম আমরা, মাঝে মাঝে ক্ষণিকের বিরতি নিলাম কেবল দম ফিরে পাবার জন্য। ভোরের দিকে বিদ্রোহ করে বসল শরীর, বাধ্য হলাম এক জায়গায় থেমে বিশ্রাম আর খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে। এরপর আবারও জোর করে পথে নামালাম সবাইকে। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে একটানা হাঁটলাম মাঝদুপুর পর্যন্ত, পেরিয়ে এলাম নদী। এরপর শুরু হলো ঘন ঝোপঝাড়ে ভরা ঢাল বেয়ে পাহাড়ের উপরদিকে ওঠা। যেখানে মোষ শিকার করেছিলাম, ঠিক সেখানকার মত পরিবেশ, তবে জায়গাটা অন্তত বিশ মাইল দূরে। এখান থেকে ওয়াম্বের আবাসস্থল মোটামুটি পঁচিশ মাইল দূরে বলে জানাল মাইওয়া।

ঘন ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে প্রায় ছ'সাত মাইল এগোলাম আমরা, এরপর পৌঁছুলাম পাতলা এক অরণ্যে। প্রায় দু'মাইল প্রস্থ ওটার, পেরুতে কষ্ট হলো না, তবে ওখানকার জমি ভীষণ ঢালু বলে কিছুটা ধকল গেল কুলিদের উপর দিয়ে। বিকেল চারটা নাগাদ বেরিয়ে এলাম অরণ্য থেকে। এরপর রয়েছে নুড়িপাথরে ভরা পাহাড়ি ঢাল, প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ, মিশেছে ছোট এক পর্বতশৃঙ্গের গায়ে। তখন শারীরিক সহ্যশক্তির প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমরা। গায়ের জোর বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই, পা ফুলে গেছে সবার।

পিছনে তাকাতেই চমকে উঠলাম। ওয়াম্বের যোদ্ধাদের বর্শা আবার দেখতে পাচ্ছি। সারাদিনে অনেকখানিই দূরত্ব কমিয়ে এসেছে ওরা, এ-মুহূর্তে বড়জোর এক মাইল পিছনে আছে আমাদের। এবার আর কুলিদেরকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হলো না। ওরাও দেখতে পেয়েছে দৃশ্যটা। আতঙ্ক দেখা দিল, পালিয়ে যেতে চাইল ওরা মালপত্র ফেলে দিয়ে।

ধমক দিয়ে থামালাম ওদেরকে। হুমকি দিলাম, যে-ই পিঠের বোঝা নামাবে, তাকেই গুলি করে খুন করব আমি। সঙ্গে সান্ত্বনার বাণীও শোনালাম—আস্থা রাখতে বললাম আমার উপর, নিশ্চয়তা দিলাম এ-বিপদ থেকে ওদেরকে উদ্ধার করব বলে। হাতিগুলোকে মারার পর থেকে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করেছি কুলিদের উপর, ফলে কাজ হলো এতে। কিছুটা সাহস ফিরে পেল ওরা। হুকুম দিলাম দ্রুত পা বাড়াবার জন্যে।

এরপর অদ্ভুত এক শক্তি আর উদ্যম লক্ষ করলাম আমি সবার ভিতর। ঝড়ের বেগে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম আমরা। দক্ষ পর্বতারোহীরাও সম্ভবত গর্ব বোধ

করত আমাদের অগ্রগতি দেখতে পেলে। কাব্য করে বলতে পারি, আমাদের পায়ের আঘাতে নুড়িপাথরে ফুলকি উঠেছিল।

এক মাইলের মত এগিয়েছি আমরা, এমন সময় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওয়াম্বের যোদ্ধারা। আমাদেরকে দেখতে পেয়েই সমস্বরে হুঙ্কার ছাড়ল। পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি উঠল, কান ঝালাপালা হয়ে গেল ওদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে। চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম আমরা, পিছনে রৈ রৈ করে ছুটে এল যোদ্ধার দল। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওদেরকে—ছোটখাট, পেশিবহুল শরীর; অস্ত্র বলতে সবার হাতে একটা করে বর্শা আর ছোট ঢাল। চেহারায় জিঘাংসা।

কুলিদেরকে পা চালাবার জন্য হাঁকডাক ছাড়লাম, কিন্তু তাতে বিশেষ উপকার হলো না। হাজার হোক, মানুষ তো ওরা। গতকাল থেকে একটানা ভারী বোঝা বইছে। শরীর আর চলতেই চাইছে না বেচারাদের। অন্যদিকে যোদ্ধাদের ঝাড়া হাত-পা, সৈনিক হিসেবে উদ্যম বেশি, এলাকাটায় চলাফেরা করে অভ্যস্ত। বেশ দ্রুত উঠে আসছে ওরা। দু'দলের মাঝখানে ব্যবধান কমে আসছে বিপজ্জনক হারে।

শেয়াল-কুকুরের প্রতিযোগিতার মত ঢালের শেষ এক মাইল পেরুলাম আমরা। বলা বাহুল্য, শেয়ালের সঙ্গে তুলনা করছি নিজেদের—ওয়াম্বের যোদ্ধারা শিকারী কুকুরের মত ধাওয়া করেছিল আমাদের। মাইওয়ার উদ্যমে আর গতির কথা ভাবলে আজও অবাক লাগে। এক মুহূর্তের জন্য হাঁপাতে দেখিনি ওকে, দেখিনি কোনও ক্লান্তির ছাপ। মেয়েটার শরীর লোহায় গড়া, নাকি তীব্র প্রতিহিংসা ওকে শক্তি জোগাচ্ছিল, কে জানে। জীবনমরণ ওই দৌড়ে দ্বিতীয় হয় ও চূড়ায় পৌছুনোর ব্যাপারে।

সবার আগে পৌঁছেছে গোবো। প্রাণের ভয়ে বোঝা নিয়ে এমন ছুট লাগিয়েছিল যে, কেউ ওকে ধরতে পারেনি।

যা হোক, একে একে সবাই পৌঁছুলাম পাহাড়ি চূড়ার গোড়ায়। হাঁপাতে হাঁপাতে সামনেটা দেখে নিলাম আমি। দেড়শো ফুট উঁচু প্রায় খাড়া এক পাঁচিল দাঁড়িয়ে আছে আমাদের চোখের সামনে। তবে আকৃতিটার গঠন এমন যে, সিঁড়ির মত বেশ কিছু প্রাকৃতিক ধাপ তৈরি হয়েছে, ওগুলোতে পা ফেলে মোটামুটি সহজভাবেই উঠে যাওয়া যাবে উপরে। খারাপ জায়গা মাত্র একটা—ক্লিফের মত অংশ ওটা, নীচে বিশাল শূন্যতা। খুব সংকীর্ণ নয়, তবে কোনোক্রমে হাত-পা ফসকালে তলায় মুখ ব্যাদান করে রেখেছে বিশাল এক ফাটল, তাতে আছড়ে পড়তে হবে। ফাটলটা মনুষ্য-নির্মিত বলে মনে হলো, সম্ভবত পাহাড়ি ঢলের পানি বেরিয়ে যাবার জন্য কাটা হয়েছে কোনোকালে। দুরন্ত স্রোতের গর্জন ভেসে আসছে নীচ থেকে, স্নায়ুর উপর চাপ ফেলছে। সন্দেহ নেই, এই গগনবিদারী আওয়াজই ওই জায়গাটা পেরুনোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ক্লিফে উঠে গেলে বাকিটুকু একেবারে সহজ পথ। চূড়ার কাছে পানির ধারে সামান্য কিছুটা অংশ কেটে রাখা হয়েছে, ওখান দিয়ে একজন করে মানুষ চলে যেতে পারবে পাহাড়ের অন্যপাশে। মাইওয়ার বক্তব্যের সত্যতা টের পেলাম। বড় একটা পাথর গড়িয়ে দিয়ে বন্ধ করে দেয়া যাবে পথটা। তখন আর কারও পক্ষে চূড়াটা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

চকিতে পিছনে তাকালাম। ওয়াম্বের যোদ্ধারা আমাদের এক হাজার গজের মধ্যে চলে এসেছে। নষ্ট করবার মত একটা মুহূর্তও হাতে নেই। চেঁচিয়ে আমার দলকে পাঁচিলে চড়ার নির্দেশ

দিলাম। মাইওয়া আমাদের গাইড, ও সবার সামনে থাকল, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সবাইকে। ওর পিছু পিছু ভারী বোঝা রওনা হলো কুলির দল।

ক্লিফে উঠতে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হলো, কারণ পিঠভর্তি ওজন নিয়ে জায়গাটা বাইতে রাজি হলো না কেউ। অগত্যা বোঝা নামিয়ে রাখতে বললাম সবাইকে, ঝাড়া শরীরে একজন করে উপরে উঠল, তারপর নীচ থেকে অন্যেরা উঁচু করে ধরল তার বোঝা, সেটা সে টেনে তুলল উপর থেকে। কাছে দাঁড়িয়ে কাজটা তদারক করলাম আমি।

এসবে বেশ সময় লেগে গেল। এই ফাঁকে অনেক কাছে চলে এল খুনে মাটুকুরা। হৈ-হল্লার আওয়াজ বেড়ে যাওয়ায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম, দেখলাম আমাদের চারশো গজের মধ্যে চলে এসেছে লোকগুলো। ভয়ানক ভঙ্গিতে নাড়ছে হাতের বর্শা। প্রমাদ গুণলাম। এখনও হাতির দাঁতগুলোই তোলা হয়নি ক্লিফের উপরে। আমিও রয়ে গেছি নীচে। সময় নেই একদম। বুঝতে পারলাম, যেভাবে হোক, কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে হবে শত্রুকে। কিন্তু কীভাবে? একটা উইনচেস্টার রিপিটিং কারবাইন আছে আমার হাতে, কিন্তু এতদূর থেকে ওটা দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারব না।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে গোবো। ওর কাছ থেকে অদল-বদল করে নিলাম অস্ত্র। কারবাইনের পরিবর্তে হাতে তুলে নিলাম এক্সপ্রেস রাইফেলটা। শত্রুপক্ষ এখন সাড়ে তিনশো গজ দূরে, কিন্তু এক্সপ্রেসের ডগায় তিনশো গজের সাইট লাগানো। বাকি পঞ্চাশ গজেও ওটা কার্যকর হবে বলে বিশ্বাস আছে আমার, তাই ছুটন্ত যোদ্ধাদের সামনের দু'জনের দিকে

ছাড়ল না। দুরন্ত এক স্রোতের মত ওরা ছুটে আসছে আমার দিকে। কারবাইন খালি হয়ে গেলে রিলোডের সময় পেলাম না। ওটাকে পিঠে ঝুলিয়ে কোমর থেকে বের করে আনলাম রিভলভার। তাক করলাম শত্রুর দিকে। আর তখুনি একটা বর্শা ছুটে এল, আমার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা। কয়েক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলে অক্কা পেতাম ওখানেই।

কুলিদের দিকে আরেকবার তাকালাম। দাঁতের দ্বিতীয় অংশটা প্রায় তুলে ফেলেছে ওরা। গোবো-সহ আরেকজন ঠেলছিল ওটা নীচ থেকে। ওদেরকে ক্লিফে উঠে যেতে বললাম। কথাটা মুখ থেকে বেরুতেই যা দেরি, পাগলের মত গোবো লাফ দিল ক্লিফের কিনারা ধরার জন্য। কিন্তু তাড়াহুড়োয় মস্ত ভুল করে ফেলল। কিনারা থেকে হাত ফসকে গেল ওর, বাঁচার জন্য পাঁচিলের গায়ের পাথর না ধরে খামচে ধরল আইভরির দাঁতটা, ওটা তখনও পুরোপুরি ওঠাতে পারেনি কুলিরা।

হাত পিছলে গেল গোবোর। ভয়ানক এক আর্তনাদ করে খসে পড়ল পাঁচিলের গা থেকে। আমার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে পাক খেয়ে দেহটা নেমে গেল পাহাড়ির ফাটলের ভিতরে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভেসে এল নদীর পানিতে ভারী কিছু আছড়ে পড়ার আওয়াজ।

স্থবির হয়ে গেলাম আমি ক্ষণিকের জন্য। মন ভরে গেল বেদনায়। বেচারা গোবো, ভীতু হলেও ওকে বেশ পছন্দ করতাম আমি। ওয়াম্বের দেশে ঘুরে বেড়ানো মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যের লিখন এড়াতে পারল না। এর জন্য আমিই দায়ী।

গোবোর সঙ্গীর মাঝে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখলাম না।

সর্দারের পরিণতি দেখে সতর্ক হয়ে গেছে, সাবধানে পাঁচিল বেয়ে উঠে গেল ক্লিফের মাথায়। কিন্তু আমি তখনও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আরেকটা বর্শা ছুটে এল, ঘ্যাচ করে গেঁথে গেল আমার দু'পায়ের মাঝখানে। ওটার দিকে তাকিয়ে সংবিৎ ফিরে পেলাম। বুঝতে পারলাম, এখন মাতম করার সময় নয়। আগে প্রাণ বাঁচাতে হবে। তাড়াতাড়ি উঠতে শুরু করলাম পাঁচিল বেয়ে। কিনারের কাছে পৌঁছুতেই দেখতে পেলাম মাইওয়ার বাড়িয়ে দেয়া হাত। ওটা ধরেছি কি ধরিনি, আচমকা টান অনুভব করলাম শরীরে। এক যোদ্ধা পৌঁছে গেছে নীচে। আমার গোড়ালি ধরে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

হাতের তালু ঘামে ভিজে গেছে আমার। আতঙ্কের সঙ্গে টের পেলাম, পড়ে যাব এখুনি। মরিয়া হয়ে চেঁচালাম, 'টানো, মাইওয়া, টানো আমাকে!'

টানল বটে মেয়েটা। আগে বুঝিনি, এত শক্তি ওর শরীরে। মেয়েদেরকে চিরকাল অসহায়, দুর্বল বলে ভেবেছি; কিন্তু সেদিন আমার ধারণা পাল্টে গেল। আমার বাম হাত ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে টানতে শুরু করল মাইওয়া। নীচ থেকে ডান গোড়ালি ধরে মাটুকু যোদ্ধাও টানছে। দড়ি টানাটানির মত অবস্থা বিরাজ করল কিছুক্ষণ, বুঝতে পারলাম—সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও মাইওয়া একটা মেয়ে, টানছে উপর থেকে। শক্ত মাটির অবলম্বন পাওয়া একজন পুরুষের সঙ্গে পেরে ওঠার কথা নয় ওর। কিছু একটা না করতে পারলে ওর হার হবে শীঘ্রি।

ডান হাতটা মুক্ত ছিল, ওটা দিয়ে কোমরের হোলস্টার থেকে বের করে আনলাম পিস্তল। কার্তুজ ভরাই আছে, হ্যামার টেনে অন্ধের মত নীচে ঘোরালাম ওটার নল। টিপে দিলাম ট্রিগার।

মাথার চাঁদি ফুটো হয়ে গেল যোদ্ধার, আর্তনাদ করে আমাকে ছেড়ে দিল, পড়ে গেল পাঁচিলের গা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় আমাকে উপরে তুলে নিল মাইওয়া।

ধাতস্থ হবার জন্য সময় নিলাম না। কুলিরা ইতোমধ্যে সমস্ত বোঝা আবার তুলে নিয়েছে পিঠে। চেঁচিয়ে এগোবার নির্দেশ দিলাম ওদেরকে। ক্লিফের নীচে আরেক যোদ্ধা উদয় হলো, ওর দিকে আমার হাতি শিকারের বন্দুক তাক করে গুলি ছুঁড়ল এক কুলি। গায়ে লাগল, নাকি লোকটা ভয় পেল, ঠিক বুঝলাম না। তবে আড়ালে চলে গেল সে।

আর দেরি নয়। দ্রুত পা চালিয়ে চূড়ার কাছে কাটা জায়গাটা পেরিয়ে এলাম আমরা। কাছে বড় বড় কয়েকটা পাথর ছিল। কুলিদের সাহায্যে ওগুলো গড়িয়ে নিয়ে গেলাম, বন্ধ করে দিলাম এপাশে আসার পথ। মাটুকুরা আটকা পড়ে গেল ওপাশে। এবার পাহাড়ের পাশ ঘুরে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ওদের।

বিপদ কেটে গেলেও থামলাম না আমরা। পাহাড়ের অন্যপাশের ঢাল ধরে তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করলাম। মাইলদুয়েক যাবার পর দেখা পেলাম ঘন অরণ্যের। এবার আর শরীর চলছে না কারোই। তাই ক্যাম্প করার নির্দেশ দিলাম।

রাতটা ওই জঙ্গলে কাটালাম আমরা। বিশ্রাম নিলাম প্রাণভরে। পালা করে একজন অবশ্য পাহারায় রইল, কারণ বিপদ আবার কোন্‌দিক থেকে আসে, তার কিছুই বলা যায় না।

উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটল না সে-রাতে।

ছয়

যুদ্ধের পরিকল্পনা

প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি গত চব্বিশ ঘণ্টার পরিশ্রমে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়লাম গভীর ঘুমের অতলে। মরা মানুষের মত ঘুমালাম রাতভর... গোবোর মত, বেচারার প্রাণহীন দেহ এখন স্রোতে ভেসে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কে জানে। হয়তো হায়েনার দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে লাশের সৎকার করতে।

ভোরবেলা ঝরঝরে শরীর নিয়ে জেগে উঠলাম। তারপর সবাই মিলে রওনা হলাম বুটিয়ানাদের গ্রামের দিকে। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছুলাম সর্দার নালার মাটির প্রাসাদে। আহামরি কিছু নয়, খোলা ময়দানের মাঝখানে জুলুদের রীতিতে তৈরি করা একটা ঘর। বৃত্তাকার সীমানায় উঁচু বেড়া আছে, ভিতরে প্রাসাদ আর গুটিকয়েক ছড়ানো-ছিটানো কুঁড়েঘর। ওখান থেকে পিছনে, বাম দিকে রয়েছে গরু-মোষের খোঁয়াড়। বুটিয়ানাদের এই বসবাসের রীতি আর আচার-আচরণ দেখে মনে হলো, ওরা প্রাচীন বাণ্টু জাতির অংশ। এই বাণ্টু জাতিই সম্রাট চাকার আমল থেকে জুলু হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

সে-রাতে সর্দার নালার সাক্ষাৎ পেলাম না। মাইওয়া একা

গেল তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। একটু পর সর্দারের এক দূত এল ভেড়া, ভুট্টা আর দুধের পাত্র নিয়ে। জানাল, উপহার হিসেবে ওগুলো পাঠিয়েছেন সর্দার, পরদিন দেখা করবেন আমাদের সঙ্গে। বিশ্রামের জন্য প্রাসাদের কাছাকাছি কয়েকটা কুঁড়েঘর দেয়া হলো আমাদেরকে, ওখানে রাতে আরাম করে ঘুমালাম আমরা।

পরদিন সকাল আটটার দিকে আবার হাজির হলো সে-দূত। জানাল, সর্দার নালা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। লোকটার সঙ্গে হাজির হলাম গোত্রপতির দরবারে। দেখা পেলাম নালার। বছর পঞ্চাশেক বয়সের একজন সুদর্শন প্রৌঢ় সে, নিখুঁত শারীরিক গঠন, কথা বলে বিচলিত ভঙ্গিতে। নিজের ঘরের বাইরে, ষাঁড়ের চামড়ায় তৈরি একটা আসনে বসে আছে লোকটা, পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাইওয়া। ওদেরকে ঘিরে রেখেছে গোত্রের জনাবিশেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—*ইন্দুনা* বলা হয় এদেরকে। আমি দরবারে হাজির হতেই কপালের কাছে হাত তুলে সালাম ঠুকল তারা।

নিজের আসন থেকে উঠে এল সর্দার, হাত মেলাল আমার সঙ্গে। তার নির্দেশে আরেকটা আসন পেতে দেয়া হলো, পাশাপাশি বসলাম আমরা। স্থানীয় ভাষায় আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাল নালা, বিপদের মাঝে তার মেয়েকে রক্ষা করার জন্য; সেইসঙ্গে ভূয়সী প্রশংসা করল আমার, গোটুকু যোদ্ধাদের বিপক্ষে অসমসাহস দেখাবার জন্য। নম্র কণ্ঠে তাকে জানালাম, সব কৃতিত্ব মাইওয়ার। ও না থাকলে কিছুতেই আমরা পৌঁছুতে পারতাম না বুটিয়ানাদের দেশে। আমার সাহসিকতারও প্রশংসা করার কিছু নেই। যা করেছি, তা নিজের প্রাণ বাঁচানোর

তাগিদেই করেছি।

সৌজন্য বিনিময় শেষ হলে মেয়ের দিকে ফিরল নালা। বলল, 'মাইওয়া, তোমার কাহিনি শোনাও আমাদের সবাইকে।'

ইন্দুনাদের দিকে ফিরে নিজের কথা বলতে শুরু করল মাইওয়া। সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁপে উঠল ও, সেইসঙ্গে শ্রোতারাও। মাইওয়া সবাইকে মনে করিয়ে দিল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওয়াম্বের বউ হয়েছিল ও, ওর বিনিময়ে শয়তানটা একটা গরুও দেয়নি বুটিয়ানাদেরকে। বরং হুমকি দিয়েছিল, নালার মেয়ে যদি তাকে বিয়ে না করে, যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। ওয়াম্বের সংসারে দুঃখ-দুর্দশা আর বুকভরা কান্না ছাড়া আর কিছুই পায়নি ও। সর্দারের মেয়ে হবার পরও ওখানে সতীনদের সঙ্গে নিচু কাজ করতে হয়েছে ওকে। মিলেছে বঞ্চনা-গঞ্জনা আর মারধর। এত সব কষ্টের মাঝে প্রাপ্তি বলতে ছিল ফুটফুটে ওই সন্তান, কিন্তু তাকেও হত্যা করা হয়েছে নৃশংসভাবে।

মাইওয়ার কথা শুনে কাঁপতে শুরু করল দরবারে উপস্থিত প্রতিটি মানুষ... রাগে, দুঃখে, ক্রোধে!

'হ্যাঁ,' বলল মাইওয়া। 'যা শুনছেন, তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। আকাশের চন্দ্র-সূর্যের মত সত্যি, পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত খাঁটি। আমার সন্তানকে সত্যিই খুন করা হয়েছে, আর এ হলো তার প্রমাণ।'

কোমরের থলে থেকে কাটা হাতটা বের করল ও, উঁচু করে দেখাল সবাইকে।

'হাত!' ফিসফিসাল সবাই। 'বাচ্চার হাত!'

'এ আমার মৃত বাচ্চার মৃত হাত,' বলল মাইওয়া। 'সঙ্গে

নিয়ে ঘুরছি, যাতে কোনোদিন না ভুলি, কী অন্যায় করা হয়েছে আমার সঙ্গে। ওয়াম্বের মৃত্যু দেখার জন্য আমি বেঁচে আছি এখন, বেঁচে আছি প্রতিশোধ নেবার জন্য। বাবা, বলুন, নিজের মেয়ে আর নাতির প্রতি করা এত বড় অন্যায় মেনে নেবেন আপনি? নিজের রক্তের এত বড় অবমাননা সহ্য করবেন?'

নালা জবাব দেবার আগেই এক পা বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে এল এক বৃদ্ধ ইন্দুনা। বলল, 'না! কিছুতেই এ সহ্য করা হবে না। শয়তানের দোসর ওই মাটুকুদের হাতে অনেক অত্যাচার সয়েছি আমরা, এবার এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।'

'আমি একমত,' মাথা ঝাঁকাল নালা। 'কিন্তু ওরা তো অনেক শক্তিশালী। কীভাবে আমরা মাটুকু জাতের বিরুদ্ধে পেরে উঠব, কেউ বলতে পারেন?'

'ওকে জিজ্ঞেস করুন,' হাত তুলে আমাকে দেখাল মাইওয়া। 'মাকুমাজান... সাদা মানুষ... মহান শিকারী। ও-ই বলতে পারবে, কীভাবে পরাস্ত করা যাবে ওয়াম্বেকে।'

সবগুলো মুখ ঘুরে গেল আমার দিকে। সবার চেহারায় নীরব জিজ্ঞাসা।

'শেয়াল কীভাবে সিংহকে ঘায়েল করতে পারে, মাইওয়া?' একটু ভেবে প্রশ্ন ছুঁড়লাম আমি।

'বুদ্ধি দিয়ে, মাকুমাজান,' জবাব দিল মাইওয়া।

'তোমাকেও তা-ই করতে হবে ওয়াম্বেকে ঘায়েল করার জন্য।'

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেলাম না। একজন বার্তাবাহক হাজির হওয়ায় আলাপে ব্যাঘাত ঘটল। জানাল, ওয়াম্বে কয়েকজন দূত পাঠিয়েছে, তারা সর্দারের সঙ্গে কথা

বলতে চায়।

'কী ব্যাপারে?' জানতে চাইল নালা।

'আপনার মেয়ে আর সাদা শিকারীকে ফেরত পাঠাতে বলছে।'

আমার দিকে তাকাল নালা। জিজ্ঞেস করল, 'কী জবাব দেব, মাকুমাজান?'

ভেবে নিলাম বিষয়টা নিয়ে। তারপর বললাম, 'রাজি হয়ে যান। এই সুযোগটা কাজে লাগানো যাবে। ওদেরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে চলে যেতে বলুন। দাঁড়ান, আমি লুকিয়ে পড়ি। দূতদের সামনে চেহারা দেখাব না।'

কাছের একটা কুঁড়েঘরে ঢুকে পড়লাম। ওখান থেকে সন্তর্পণে নজর রাখলাম দরবারের উপর।

একটু পর পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা হলো মাটুকু দূতদেরকে। মোট চারজন ওরা। দলপতি বিশালদেহী। সবার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। সম্ভবত রাতভর হাঁটতে হয়েছে পাহাড়ের পাশ ঘুরে এখানে আসার জন্য, নইলে এত দ্রুত কিছুতেই পৌছুতে পারত না। নালার সামনে পৌছে দায়সারা ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল। সম্মান দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু হাবভাবে প্রকাশ পাচ্ছে চরম ঔদ্ধত্য।

'কী চাই?' মুখ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল নালা।

'সর্দার ওয়াম্বের পক্ষ থেকে এসেছি আমরা,' জানাল বিশালদেহী নেতা। 'তাঁর ভৃত্য নালার জন্য বার্তা নিয়ে এসেছি।'

'বলো, আমি শুনছি।'

'ওয়াম্বে বলেছেন, তাঁর স্ত্রী মাইওয়াকে এখুনি ফেরত পাঠানো হোক, ধোঁকা দিয়ে সে পালিয়ে এসেছে এখানে।

সেইসঙ্গে ফেরত পাঠানো হোক ওই দুর্বিনীত সাদা শিকারীকে, যে বিনা অনুমতিতে ওয়াম্বের এলাকায় শিকার করার দুঃসাহস দেখিয়েছে... এমনকী মাটুকু যোদ্ধাদেরকে পর্যন্ত খুন করেছে!'

'যদি ওদেরকে না পাঠাই?' জিজ্ঞেস করল নালা।

'তা হলে ওয়াম্বের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করব আমরা। তিনি আপনাদেরকে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে দেবেন, মাটিতে মিশিয়ে দেবেন বুটিয়ানাদের রাজ্য।' গলার কাছে হাত নিয়ে ছুরি চালানোর একটা ভঙ্গি করল দূত—হুমকিটা জোরালো করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

'খুবই কঠিন কথা,' বলল নালা। 'জবাব দেবার আগে আমাকে পরামর্শ করতে দাও।'

ছোট্ট একটা নাটক করা হলো এরপর। দূতরা দরবার থেকে বেরিয়ে গেল, তবে দৃষ্টিসীমার বাইরে নয়। ইন্দুনাদেরকে নিয়ে গোল হয়ে বসল নালা, ওদেরকে দেখানোর জন্য। সবাই মিলে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল। মাইওয়া রয়েছে পাশে, হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল খানিক পরে। দূতদেরকে শুনিয়ে করুণা চাইল বাবার কাছে, বলল ওকে রক্ষা করতে। কিন্তু মাথা নাড়ল নালা। চেহারায় কাঠিন্য ফুটিয়ে একটু পরে ডেকে পাঠাল দূতদেরকে। মাইওয়া তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে—পুরোটাই অভিনয়, কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই।

'ওয়াম্বে একজন মহান সর্দার,' বলল নালা। 'এই মেয়ে তার স্ত্রী। স্ত্রীকে ফেরত চাইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তার। তাই ওকে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। কিন্তু এ-মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়। লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আসায় ওর পা জখম হয়ে গেছে, হাঁটতে পারবে না, বয়ে নিয়ে যেতে হবে তোমাদেরকে।

খামোকা এই কষ্ট করবে কেন তোমরা? তাই ওয়াম্বেকে বোলো, আজ থেকে আটদিন পরে, পা ভাল হয়ে গেলে ওকে পাঠাব আমরা। নিজ দায়িত্বে... আমার একদল লোক-সহ। আর ওই সাদা শিকারীর ব্যাপারে এটুকুই বলতে চাই—ওর কর্মকাণ্ডের জন্য আমি কোনোভাবেই দায়ী নই। ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছে সে। কী কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে, তা আমার জানা ছিল না। অবশ্যই ওকে ফেরত পাঠাব আমি। ওয়াম্বের সঙ্গে কোনও অন্যায় করে থাকলে ওয়াম্বেই ওর বিচার করবে। তোমাদের সর্দারকে জানিয়ো, আমার মেয়ের সঙ্গে ও-ও যাবে মাটুকু রাজ্যে। আপাতত তোমরা যেতে পারো। অনেকদূর থেকে এসেছ, যাবার আগে খেয়ে-দেয়ে যেয়ো। অ্যাই, কে আছিস, ওয়াম্বের দূতদেরকে ভালমত খানাপিনা করতে দে। আর হ্যাঁ, সর্দারের জন্য কিছু উপহারও নিয়ে যেয়ো... আমার মেয়ের অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওসব দিচ্ছি আমি।'

প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করল দূতেরা। মাইওয়াকে তখুনি নিয়ে যাবার কথা ওদের। কিন্তু সত্যিই জখম হয়েছে মেয়েটার পা, ফুলে গেছে... তা দেখানোর পর নালার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় রইল না ওদের। হাজার হোক, কে-ই বা চাইবে ওকে ঘাড়ে করে মাটুকু রাজ্য পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে!

খাওয়াদাওয়া করে দূতেরা চলে যাবার পর কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। সর্দার আর আর ইন্দুনাদের সঙ্গে বসে পড়লাম পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করার জন্য। শুরুতেই নালাকে জানিয়ে দিলাম, খয়রাতি উপদেশ দিতে রাজি নই আমি, আমার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা ভাগাভাগির বিনিময়ে কিছু দিতে হবে আমাকে।

'কী চাও তুমি, সাদা মানুষ?' জানতে চাইল নালা।

'ওয়াম্বের কাছে হাতির দাঁতের বিরাট এক ভাণ্ডার আছে বলে শুনেছি,' বললাম আমি। 'যদি এ-যুদ্ধে জয়ী হতে পারি, তা হলে ওগুলোর দখল নেব আমি। দাঁতগুলো উপকূল পর্যন্ত নেবার জন্য লোকও দিতে হবে আমাকে।'

'এই-ই?' হাসল নালা। 'এ-প্রস্তাব এখুনি মেনে নিচ্ছি আমি।'

'আরও আছে,' তাকে বাধা দিয়ে বললাম আমি। 'ওয়াম্বের বন্দিশালায় একজন সাদা মানুষ আটক হয়ে আছে। তার মুক্তি চাই আমি। যুদ্ধজয়ের সম্পত্তি থেকে ও যদি কিছু দাবি করে, তা-ও দিতে হবে।'

শুধুমাত্র জন এভারির কারণেই আসলে এ অভিযানে অংশ নিচ্ছি আমি, কিন্তু সেটা ওদেরকে খুলে বললাম না।

'অবশ্যই ওকে মুক্তি দেয়া হবে, মাকুমাজান,' পিতার পক্ষ থেকে বলে উঠল মাইওয়া।

'আমার শেষ শর্ত,' যোগ করলাম আমি, 'লড়াইয়ে কোনও নারী বা শিশুর প্রাণ নেয়া যাবে না।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল নালা। 'ঠিক আছে, এ-ও মেনে নিলাম।'

এরপর আমরা যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজাতে বসলাম। আলাপ-আলোচনায় বোঝা গেল, ওয়াম্বেকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই, মুহূর্তের নোটিশে অন্তত ছ'হাজার যোদ্ধা মাঠে নামাবার ক্ষমতা আছে তার; এর মধ্যে তিন-চার হাজার সবসময় তার বাসস্থানের পাহারায় থাকে, এর ফলে জায়গাটা দুর্ভেদ্য। অপরদিকে নালার ক্ষমতা বড়ই কম। বড়জোর হাজার-বারোশ'

যোদ্ধা আছে তার হাতে। তবে জুলু জাতের বৈশিষ্ট্য থাকায় এরা সবাই অত্যন্ত দুর্ধর্ষ লড়াকু। প্রত্যেকেই মাটুকুদের চাইতে ভাল যোদ্ধা।

সৈন্যসংখ্যার এই তারতম্যকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। এরচেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে ওয়াম্বের দুর্ভেদ্য এলাকা। ওখানে যুদ্ধের ফলাফল-নির্ধারণী হামলা চালানো অত্যন্ত দুরূহ। পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মাটুকু জাতির শহর, চারপাশ পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এ ছাড়াও পাহাড়ের গায়ে রয়েছে অসংখ্য গুহা আর ফাটল—রক্ষণাত্মক অবস্থান নেবার জন্য একেবারে আদর্শ। আজ পর্যন্ত কেউ ওখানে সুবিধে করতে পারেনি। বুটিয়ানাদের কাছে জানলাম, জুলু রাজা ডিংগানের আমলে একবার রাজার যোদ্ধারা হামলা চালিয়েছিল মাটুকুদের উপর, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। হাজারখানেক যোদ্ধাকে হারিয়ে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়েছিল ওরা।

ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম। মাইওয়াকে ভালমত জিজ্ঞাসাবাদ করলাম ওখানকার রক্ষণাত্মক ব্যূহ আর চারপাশের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে। নিশ্চিত হলাম, সম্মুখসমরের জন্য জায়গাটা সত্যিই দুর্ভেদ্য, তবে পিছনের দিকটা কিছুটা অরক্ষিত। পাহাড়ি ঢাল রয়েছে ওপাশটায়, দেয়াল আছে মাত্র দু'টা। পাহাড় টপকে ওখান দিয়ে আক্রমণ করা একেবারে দুঃসাধ্য বলে এই খামখেয়ালি। গোপন একটা রাস্তা আছে অবশ্য, তবে সেটা কেবল সর্দার আর ঘনিষ্ঠ অনুচর ছাড়া আর কেউ চেনে না।

'হুম,' বললাম গম্ভীর স্বরে। 'এই গোপন পথটা কি চেনো তুমি, মাইওয়া?'

'হ্যাঁ,' বলল মেয়েটা। 'আমি বোকা নই, এমন দিন আসতে পারে ভেবে বহুদিন আগেই ওই পথের গোমর জেনে নিয়েছি।'

'তা হলে একদল যোদ্ধাকে তুমি ওই পথে গাইড করে নিয়ে যেতে পারবে?'

'পারব। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ওয়াম্বে যেন টের না পায়, আমরা ওখান দিয়ে আসছি। সেক্ষেত্রে পথটা বন্ধ করে দেবে ও।'

'আশা করি ওকে অন্ধকারে রাখতে পারব,' বললাম আমি। ফিরলাম নালার দিকে। 'আমার পরিকল্পনা তা হলে শুনুন, সর্দার। আপনার দূতদেরকে পাঠিয়ে দিন চারদিকে। তিনদিন পর যেন সমস্ত যোদ্ধারা জড়ো হয় এখানে। চতুর্থ দিনে এদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে মাইওয়া—সংক্ষিপ্ত পথে নয়, বরং পাহাড়ের পাশ ঘুরে লম্বা পথটা ধরে হাজির হবে মাটুকুদের রাজ্যে। মোটামুটি তিনদিন লাগবে পথে*, তৃতীয় দিন রাতে যোদ্ধাদেরকে ওয়াম্বের আস্তানার পিছনের পাহাড়ে তুলে ফেলবে ও। ওখানেই লুকিয়ে পড়বে।

'অন্যদিকে আজ থেকে ষষ্ঠদিনে আরেকদল রওনা হবে এখান থেকে। আপনার একজন ইন্দুনা, সঙ্গে দুইশ' সশস্ত্র লোক নিয়ে রওনা হবে মাটুকু রাজ্যের দিকে। আমি আর আমার কুলিরা বন্দির মত থাকব ওদের সঙ্গে, আর থাকবে একটা মেয়ে—দেখতে অনেকটা মাইওয়ার মত... আশা করি তেমন কাউকে খুঁজে বের করতে পারবেন বুটিয়ানাদের মাঝ থেকে। সবার হাত বেঁধে রাখা হবে, যাতে দূর থেকে সত্যিকার বন্দির

---

* *তিন দিনে একদল যোদ্ধা একশো বিশ মাইল অতিক্রম করতে পারে—সম্পাদক।*

মত লাগে। এই দলের সঙ্গে অস্ত্র হিসেবে থাকবে শুধু বন্দুক আর একটা ছোট বর্শা। পাহাড়চূড়ার এই সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে যাবে এরা, ওপাশে গিয়ে মাটুকুদের সঙ্গে দেখা করবে। জানাবে, শর্ত মোতাবেক ওয়াম্বের পায়ে নিবেদন করতে যাচ্ছে মাইওয়া আর সাদা শিকারীকে। কোনোরকম বাধা দেয়া হবে ওদেরকে, কাজেই সপ্তমদিনে ওয়াম্বের আস্তানায় পৌঁছে যাব আমরা।

'মাইওয়ার কাছে শুনেছি, ওখানকার ফটকের পাশে একটা ছোট টিলা আছে, যুদ্ধের সময় ছাড়া ওখানে কাউকে রাখা হয় না, টিলাটা খুব কাজে লাগবে আমাদের। কাজেই অষ্টম দিনের ভোরে... সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়ব আমরা। মাইওয়া ওর দলবল নিয়ে গোপন পথ ধরে নেমে আসবে শহরের পিছনদিকে। ওখানে আগুন ধরাবে ওরা, আগুনের শিখা ঢেকে দেবে ভেজা পাতা দিয়ে। ফলে প্রচুর ধোঁয়া সৃষ্টি হবে, ঢাকা পড়ে যাবে গোটা শহর। আমরা... মানে দ্বিতীয় দল তখন শহরের ভিতরে গোলাগুলি শুরু করব। আমাদেরকে থামাবার জন্য ছুটে আসবে মাটুকু যোদ্ধারা, তবে ভয়ের কিছু নেই। ওই টিলার উপরে আশ্রয় নেব আমরা, ওখান থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

'এই ফাঁকে যোদ্ধাদের মূল দলটা আক্রমণ চালাবে পিছন থেকে। দ্বিমুখী আক্রমণের মাঝে দিশেহারা হয়ে যাবে মাটুকুরা, অপ্রত্যাশিত হামলায় প্রতিরোধ গড়ার সুযোগ পাবে না। আশা করছি, ওরা নিজেদের গুছিয়ে নেবার আগেই যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারব আমরা, বাধ্য করতে পারব হার মেনে নিতে। এই-ই আমার পরিকল্পনা। এবার বলুন, আপনারা এতে রাজি আছেন কি না।'

'চমৎকার!' বলে উঠল নালা। 'চমৎকার পরিকল্পনা! তুমি তো দেখছি শেয়ালের চেয়েও চতুর, সাদা মানুষ! হ্যাঁ, তোমার কথামতই হবে সব। বুটিয়ানারা এবার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, চিরদিনের মত খতম করে দেবে ওয়াম্বের শোষণ আর শাসন। মাটুকুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাব আমরা।'

মাইওয়া উঠে দাঁড়াল। থলে থেকে বাচ্চার হাতটা আবার বের করল ও, সেটা স্পর্শ করে নিজের পিতা আর অন্যান্য ইন্দুনাদেরকে শপথ নেয়াল, প্রতিশোধের এ-লড়াইয়ে কেউ পিছু হটবে না। ফলাফল যা-ই হোক, এ-যুদ্ধের শেষ দেখে ছাড়বে ওরা।

শপথ গ্রহণের এ-দৃশ্য বড়ই অদ্ভুত। এই শপথের কারণেই আজও আফ্রিকার ওই এলাকায় যুদ্ধটাকে *ছোট হাতের যুদ্ধ* বলে সবাই।

পরের দুটো দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। দূত পাঠিয়ে দেয়া হলো সর্বত্র, আদেশ দেয়া হলো সক্ষম প্রতিটি বুটিয়ানা পুরুষকে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য সমবেত হতে। নালার বাসস্থানের আশপাশে খুব বেশি খালি জায়গা নেই, কাজেই দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা নাগাদ যখন প্রায় সাড়ে বারোশ' যোদ্ধা হাজির হলো ওখানে, রীতিমত গাদাগাদির সৃষ্টি হলো। সবাই তাদের অ্যাসেগাই, ঢাল আর বল্লম নিয়ে এসেছে, বুকে কাঁপন ওঠে ভয়ঙ্করদর্শন এই লোকগুলোকে দেখলে।

পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গেল এই যোদ্ধাদল। এর আগে সবাইকে ভালমত বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে কী করতে হবে। দলের নেতৃত্বে রইল খোদ নালা, কারণ সে বুঝতে পেরেছে যুদ্ধটার

গুরুত্ব। তার কর্তৃত্ব আর শাসনভার সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে এর ফলাফলের উপর, তাই আর কারও হাতে দলের ভার দিতে সাহস পেল না। ওদের সঙ্গে গেল মাইওয়া, গাইড হিসেবে দলটাকে ওয়াম্বের আস্তানার পিছনের পাহাড়ে নিয়ে যাবে ও। ওদেরকে দু'দিন বাড়তি সময় দিয়েছি, কারণ মাটুকুদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য ঘুরপথে একশো মাইলের বেশি অতিক্রম করতে হবে দলটাকে।

ষষ্ঠ দিনের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে রওনা হলাম আমি। কলিরাও আছে তবে ওদের অধিকাংশই যাচ্ছে ইচ্ছের বিরুদ্ধে। জেনেশুনে সিংহের মুখে হাত ঢোকাবার আগ্রহ নেই কারও। বেঁকেই বসত, যদি না নালার সৈন্যরা ভয় দেখাত ওদের। তা ছাড়া আমার উপরেও কিছুটা আস্থা আছে ওদের, এ-দু'য়ে মিলে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজি হয়েছে ওরা।

আমাদের দলে আছে দুইশ' বুটিয়ানা। সবাইকে বন্দুক দেয়া হয়েছে। প্রাচীন আমলের গাদা বন্দুক থেকে শুরু করে আধুনিক রাইফেল পর্যন্ত সবই জোগাড় করা হয়েছে খুঁজে-পেতে। যদিও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে ওদের কেউই স্বচ্ছন্দ নয়। মনের মধ্যে কিছুটা খুঁতখুঁতানি থাকলেও এ-ব্যাপারে কিছু করার নেই। এদের সঙ্গে ঢাল-তলোয়ার রাখা হয়নি, মাথায় নেই মস্তকাবরণ, চামড়াতেও আঁকা হয়নি কোনও যুদ্ধ-সঙ্কেত। সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে যোদ্ধাসুলভ সমস্ত সাজ, যাতে মাটুকুদের মনে কোনও ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

মাইওয়ার এক সৎ-বোনও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। শারীরিক আকার-অবয়ব পুরোপুরি একরকম তার। চেহারায়ও দু'বোনের প্রচুর মিল আছে। এই মেয়ে মাইওয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছে।

সেদিন রাতে পাহাড়চূড়ায় বিশ্রাম নিলাম আমরা। পরদিন ভোরে পাথর সরিয়ে খোলা হলো পথ, তারপর পাহাড়ি ঢাল ধরে নামতে শুরু করলাম মাটুকু রাজ্যে। আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা যোদ্ধাদের লাশ আর কঙ্কাল দেখতে পেলাম, যারা আমার রাইফেলের গুলিতে নিহত হয়েছে। সহযোদ্ধারা সৎকারের ঝামেলায় যায়নি, মৃতদেহগুলো ফেলে রেখে গেছে শেয়াল-কুকুর আর শকুনের খাবার হবার জন্য। পাহাড়ি ওই ফাটলের তলায় যখন পৌঁছুলাম, তখন চঞ্চল দৃষ্টি বোলালাম গোবোর লাশ দেখার আশায়। কিন্তু দেখতে পেলাম না। কোথায় পড়েছিল, তা অবশ্য বোঝা গেল—এখনও পাথরের গায়ে লেগে আছে শুকনো রক্ত। এরপর লাশ পানিতে ভেসে গেছে, নাকি শকুন-টকুনে তুলে নিয়ে গেছে, তা বোঝার উপায় নেই।

মাটুকু এলাকায় পা ফেলার পর খুব সাবধানে এগোলাম আমরা। জনাপঞ্চাশেক লোক রইল সামনে, অতর্কিত হামলা হলে ওরা পিছনের দলকে সতর্ক করে দেবে। পিছনেও একই কায়দায় আরও পঞ্চাশজন থাকল। বাকি একশো লোক রইল মাঝখানে, মৌমাছির মত ঘিরে রাখল বন্দিদেরকে—মানে আমি, আমার কুলি-বাহিনী, আর মাইওয়ার ছদ্মবেশ নেয়া মেয়েটাকে। আমাদের অনেকের হাতই বেঁধে রাখা হয়েছে। মাইওয়ার বোন একটা বড় চাদর জড়িয়েছে গা আর মাথায়, মুখ ঢেকে রেখেছে তার আড়ালে। তাল মিলিয়ে হাঁটছি আমরা, কিন্তু অভিনয় করছি চরম অসহযোগিতার—যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরকে। সরাসরি ওয়াসেগু শহরে যাচ্ছি আমরা, পাহাড় থেকে ওখানকার দূরত্ব মোটামুটি পঁচিশ মাইলের মত।

পাঁচ মাইলের মত এগিয়েছি, হঠাৎ সামনে উদয় হলো

জনাপঞ্চাশেক মাটুকু যোদ্ধা। বোঝা গেল, আমাদের অপেক্ষায় ছিল ওরা। পথ আটকে সামনে এগোল তারা, আমাদের দলপতিকে জিজ্ঞেস করল পরিচয়।

'সর্দার নালার প্রতিনিধি আমরা,' জানাল দলপতি, 'ওয়াম্বের পলাতক স্ত্রী আর অবাধ্য সাদা শিকারীকে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের শহরে... সর্দারের পায়ে নিবেদন করতে।'

ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকাল মাটুকু যোদ্ধাদের নেতা। 'এত লোক কেন তোমাদের সঙ্গে?'

'সতর্কতার জন্য। এই সাদা শিকারী আর তার দলবল বড়ই ভয়ানক। অল্প লোক পাঠালে তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাননি আমাদের সর্দার, ওদেরকে সর্দার ওয়াম্বের কাছে পৌঁছুতে না পারলে তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব আমরা।'

'কাকে ভয় পাচ্ছ? ওকে?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিতে হাসল মাটুকু নেতা। সন্দেহ দূর হয়ে গেছে চোখের তারা থেকে। ঠাট্টা মশকরা করতে শুরু করল আমাকে নিয়ে। তাচ্ছিল্যের সুরে এমন সব কথা বলল, শুনে গা জ্বালা করতে থাকল। পারলে ওখানেই উচিত শিক্ষা দিতাম ব্যাটাকে, কিন্তু সে-উপায় নেই। তাই মুখ বুজে সহ্য করলাম অপমান। চেহারায় ফুটিয়ে রাখলাম ভয় পাবার ভঙ্গি। অবশ্য স্বীকার করতে দোষ নেই, মনে মনে সত্যিই সিঁটিয়ে আছি আমি। কত বড় ঝুঁকি নিয়েছি, তা আমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। সব গুবলেট হয়ে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। আর তার মানে একটাই—নিশ্চিত... ভয়াবহ মৃত্যু।

মাটুকু নেতা সরোষে জানাল, তার সঙ্গী-সাথীকে খুন করার

শাস্তি পেতে হবে আমাকে। খুব শীঘ্রি সিংহ মারার ফাঁদে ফেলে হত্যা করা হবে আমাকে। মাটুকুরা মনের সুখ মিটিয়ে দেখবে সে-দৃশ্য। কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলাম না। বলা যায় না, সত্যি সত্যি হয়তো অমন মৃত্যু অপেক্ষা করছে আমার জন্য। পিছিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল হতো। বুটিয়ানাদের কপালে যা-খুশি ঘটুক, তাতে আমার কী? মাইওয়ার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন? কিন্তু সমস্যা হলো জন এভারি। ওকে এই নরকের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই যত বিপদই আসুক, ওকে মুক্ত করার চেষ্টা আমাকে চালাতেই হবে।

যা-হোক, নতুন এক সমস্যার সূত্রপাত হলো এবার। ওয়াম্বের যোদ্ধারা জানাল, ওরা আমাদের সঙ্গে যাবে। তাতে আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল চলার গতি নিয়ে। আমাদেরকে দ্রুত হাঁটার জন্য তাড়া দিতে শুরু করল ওরা। চাইছে সন্ধ্যার আগেই শহরে পৌঁছুতে। ওতে রাজি হবার উপায় নেই। ধীরে-সুস্থে যাবার পিছনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে আমাদের। সন্ধ্যার দিকে পৌঁছুলে সুবিধে আমাদের—আলো কমে যাবে, ঠিকমত আমাদের সবাইকে দেখতে পাবে না মাটুকুরা। গোলমাল যখন শুরু হবে, তখন অন্ধকারের আড়াল নিয়ে শহরের ভিতরের টিলাটার কাছে সহজে পৌঁছুতে পারব আমরা। মাটুকুদের তো সে-কথা বলা যায় না।

শুরুতে অগ্রাহ্য করলাম ওদের তাড়া। পরে ওরা যখন বাড়াবাড়ি শুরু করল, তখন সাফ সাফ জানিয়ে দেয়া হলো—এর চেয়ে দ্রুত এগোনো সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। অজুহাত দেখানো হলো—ওয়াম্বের বউয়ের পা ফুলে গেছে, সে হাঁটতে

পারছে না। বলা বাহুল্য, এ-অজুহাত মানতে রাজি হলো না মাটুকুরা। ঝামেলা একটা ওখানেই বেধে যেত হয়তো, কিন্তু কী ভেবে ওরা যেন শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। সংখ্যায় আমরা ওদের চারগুণ—এটা একটা কারণ হতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে, সর্দারের তরফ থেকে কোনও নির্দেশ পেয়েছে ওরা, যাতে বন্দিরা শহরে পৌঁছুনোর আগে কোনও ধরনের ক্ষতি করা না হয়। কারণ যা-ই হোক, আমাদেরকে নিজ গতিতে চলতে দিল যোদ্ধারা।

বেলা সাড়ে চারটার দিকে পাথুরে একটা শৈলশিরার উপরে পৌঁছুলাম আমরা। ওখান থেকে ছ'সাত মাইল দূরে, প্রায় তিন হাজার ফুট নীচে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওয়াম্বের শহর। বড় এক উপত্যকার মাঝে গড়ে উঠেছে ওই শহর। ব্যতিক্রম কেবল ওয়াম্বের বাড়ি। আমাদের মুখোমুখি যে-পাহাড়টা রয়েছে, সেটার ঢালে, বড় বড় কতগুলো গুহামুখের সামনে তৈরি করা হয়েছে ওটা। সর্দারের আবাসস্থলের ছাদে প্রহরারত যোদ্ধাদল দেখতে পেলাম, শেষ বিকেলের রোদে ঝিকমিকিয়ে উঠছে ওদের হাতে ধরা বর্শার ফলা।

এতদূর থেকেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কতটা সুরক্ষিত ওই শহর। পাথুরে, ভীমদর্শন দেয়ালে ঘেরা সীমানা। কামান ছাড়া ওগুলো ধসানো সম্ভব নয় কোনোমতেই। কামানেও পুরোপুরি কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। দুর্গের মত বাড়িঘর আর গুহামুখের কতই বা আর ক্ষতি করতে পারবে গোলা!

পাহাড়ি ঢাল বেয়ে কষ্টেসৃষ্টে নামতে শুরু করলাম আমরা। পুরো পথ ঢাকা পড়ে আছে বিশাল বিশাল সব পাথরে, পাহাড়ি ঢলের পানির আঘাতে ওগুলোর গা একেবারে মসৃণ, পা পিছলে

যেতে চায়। ফড়িঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে এক পাথর থেকে আরেক পাথরে গেলাম আমরা, সারাক্ষণ যুঝলাম ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। পুরো দু'ঘণ্টা লেগে গেল তলায় পৌঁছুতে। ততক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি।

এর কিছুক্ষণ পরে, যখন আঁধার নেমে আসছে, উপত্যকার প্রান্তর পেরিয়ে প্রথম সারি দেয়ালের কাছে পৌঁছুলাম আমরা। তিন-পাথর পরিমাণ পুরু ওটা, প্রবেশপথটা এত সরু, কোনোমতে একজন মানুষ সেখান দিয়ে যেতে পারে। ওটা পেরুলাম বিনা-প্রশ্নে, সঙ্গে থাকা মাটুকু যোদ্ধারা প্রহরীদের কাছে নিশ্চিত করল আমাদের পরিচয়।

এরপর রয়েছে খোলা একটা জায়গা, প্রস্থে তিনশো কদম, বা তারও বেশি। জমিটা পাথুরে, রুক্ষ, এখানে-ওখানে নানা রকম ফাটল। বাড়িঘর নেই কোনও। লড়াই-টড়াই বাধলে এখানে গরু-মোষ এনে রাখা হয়। খোলা জায়গাটার পরে রয়েছে দ্বিতীয় দেয়াল। সেখানে ইংরেজি *ভি* অক্ষরের আদলে একটা প্রবেশপথ, তার ওপাশে রয়েছে ছোট সেই টিলাটা, যেটার উপরে রক্ষণাত্মক অবস্থান নেব বলে ঠিক করেছি আমরা।

হাঁটতে হাঁটতে আমাদের দলপতির সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বললাম আমি, জানিয়ে দিলাম পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে। সেই মোতাবেক দ্বিতীয় প্রবেশপথের সামনে গিয়ে থেমে গেলাম আমরা। মাটুকু নেতাকে আমাদের দলপতি জানাল, আপাতত এখানেই থাকব আমরা, ওয়াম্বের নির্দেশ পেলে তারপর ঢুকব শহরে।

'ভাল প্রস্তাব, কোনও অসুবিধে নেই,' বলল মাটুকু নেতা। 'কিন্তু বন্দিদেরকে পাঠাতে হবে এখুনি। কারণ আমাদের সর্দার

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ওই সাদা শিকারীর জন্য। তাকে শাস্তি দিতে না পারায় রাতে ঠিকমত ঘুমাতে পারছেন না। আর বউয়ের জন্যও উতলা হয়ে আছেন তিনি।'

'তা কী করে হয়?' প্রতিবাদ করল আমাদের দলপতি। 'আমার উপর নির্দেশ আছে, সরাসরি সর্দার ওয়াম্বের হাতে তুলে দিতে হবে বন্দিদেরকে। তোমার হাতে নয়। যদি উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে যায়, কে জবাবদিহি করবে?'

'ধ্যাত্তেরি! এখানে আবার উল্টোপাল্টা কী ঘটবে?'

'অতশত বুঝি না। যে-নির্দেশ পেয়েছি, তা-ই পালন করব আমি। তুমি যাও, সর্দারের অনুমতি নিয়ে এসো। ভয়ের কিছু নেই, আমরা কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি না। এখানেই অপেক্ষা করব।'

ইতস্তত করল মাটুকু নেতা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনে নিল প্রস্তাবটা। 'ঠিক আছে, থাকো তোমরা। আমি যাচ্ছি সর্দারের কাছে। খুব শীঘ্রি ফিরে আসব।'

হাঁটতে শুরু করল লোকটা। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু থামল সে। বিষ মেশানো কণ্ঠে বলল, 'সূর্যের শেষ আলো দেখে নাও, সাদা মানুষ। কাল সকালের সূর্যোদয় আর কপালে নেই তোমার!'

কথাটা বলেই চলে গেল সে।

বলে রাখা ভাল, পরদিন আমি না, ও নিজেই মারা গিয়েছিল। গুলি খেয়েছিল আমার হাতে। সত্যি কথা হলো, আজ পর্যন্ত যত মানুষ আমার হাতে মারা গেছে, তাদের ভেতর শুধু এই লোকটার কথা ভেবেই আমি কখনও দুঃখ পাই না, কিংবা অনুভব করি না কোনও শোক।

সাত

আক্রমণ

যেখানে থেমেছি আমরা, তার পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে একটা ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা। ওটার দিকে চোখ পড়তেই একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। টিলায় ওঠার পর পর হয়তো পানি পাব না। তাই আমাদের দলপতিকে ডেকে বললাম, সে যেন সবাইকে ওখান থেকে পেট ভরে পানি খেয়ে নিতে বলে। সঙ্গে সাত-আটটা রান্নার পাত্র আছে আমাদের, ওগুলোও ভরে নেবার পরামর্শ দিলাম।

এরপর মাথা ঘামাতে হলো সবচেয়ে বড় সমস্যাটা নিয়ে। টিলায় উঠব কীভাবে? মনে হলো এগিয়ে গিয়ে সরাসরি চেষ্টা চালানোই ভাল। তাই পানি খাওয়া শেষে একযোগে আগে বাড়লাম আমরা। দেয়ালের সরু প্রবেশপথের সামনে পৌঁছুলে বাধা দেয়া হলো আমাদেরকে। গাঁট্টাগোট্টা দুই পালোয়ান পাহারা দিচ্ছে ওখানটায়। আমাদেরকে দেখেই অস্ত্র তুলল, জানতে চাইল কী চাই।

বুটিয়ানা দলপতি জানাল, মত পাল্টেছি আমরা। এখুনি সর্দার ওয়াম্বের প্রাসাদে যাব বলে ঠিক করেছি। বলা বাহুল্য, পথ

ছাড়তে রাজি হলো না দুই প্রহরী। আমাদেরকে পিছিয়ে যাবার নির্দেশ দিল, সেই সঙ্গে বলল অপেক্ষা করতে।

ওদের নির্দেশ মেনে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মাত্র দু'জন ওরা, আর আমরা দুই শতাধিক। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে ওদেরকে সরিয়ে দিলাম প্রবেশপথ থেকে, গায়ের জোরে ঢুকে পড়লাম মাটুকু-শহরে। টিলাটা ফটক থেকে শ'খানেক গজ দূরে, ওদিকে দ্রুত পা চালালাম। দুই প্রহরীকে ছুটে যেতে দেখলাম শহরের দিকে, উচ্চস্বরে হাঁকডাক ছাড়ছে। একটু পরেই একদল সশস্ত্র লোক বেরিয়ে এল, হৈ-হল্লা করে ধাওয়া করল আমাদেরকে।

আমরাও দৌড়াতে শুরু করলাম টিলা লক্ষ্য করে। কোথায় যাচ্ছি, সাঁঝের আঁধারের কারণে তা প্রথমে বুঝতে পারল না মাটুকুরা। যখন বুঝল, তখন দেরি হয়ে গেছে। প্রাণপণে চেষ্টা করল ওরা টিলায় যাবার পথটা আটকাতে, কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছি আমরা, ওরা কিছু করার আগেই উঠে পড়লাম ওখানে। একজন শুধু পারল না, হুমড়ি খেয়ে পিছনে পড়ে গেল সে। উঠে দাঁড়াবার আগেই বন্দি হলো শত্রুর হাতে। পরে জেনেছিলাম, আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে মুখ খুলতে রাজি না হওয়ায় ওকে খুন করা হয়েছিল। একদিক থেকে কপাল ভাল তার, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ওর পিছনে বেশি সময় দিতে পারেনি মাটুকুরা, নইলে বন্দি প্রতিপক্ষকে নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে হত্যা করে ওরা।

যা হোক, টিলাটা প্রায় আধ একর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে; ওটায় আমরা উঠে পড়তেই নীচে ধাওয়ারত মাটুকুরা থেমে গেল। এগোল না আর, জায়গাটার রণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ওরা। খামোকা প্রাণ খোয়াতে চাইল না।

সূর্য পুরোপুরি ডুবে যাবার আগে যতক্ষণ আলো পাওয়া গেল, তার মধ্যে জায়গাটা দেখে নিলাম আমরা। মাইওয়ার ধারণা ঠিক, টিলায় আর কেউ নেই। পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে ওটার সীমানা, ভিতরে রয়েছে তিনটা বড় বড় গুহা আর ছোটখাট বেশ কিছু সুড়ঙ্গ। টিলার জরিপ শেষ হলে সৈন্য সাজানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা জায়গায় মোতায়েন করলাম সশস্ত্র বুটিয়ানাদেরকে। কুলিদেরকে অবশ্য ও-কাজে লাগালাম না। ভীতুগুলোকে একবিন্দু বিশ্বাস করতে পারছি না। সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাবে, মাটুকুদের কাছে ফাঁস করে দেবে আমাদের পরিকল্পনা। তাই চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা করলাম ওদেরকে। ভয় দেখালাম, পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করে মারব।

একটু পরই নেমে এল ঘনঘোর রাত। অন্ধকারের মাঝে পরিচিত একটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম—আমাদের সঙ্গে আসা সেই যোদ্ধাদলের নেতা। চেঁচিয়ে আমাদেরকে টিলা থেকে নেমে আসতে বলছে। জবাবে তাকে জানানো হলো, এই অন্ধকারের মাঝে ঢাল ধরে নামা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে, হোঁচট খেয়ে হাত-পা ভাঙবে। সে যেন সকালে আসে। জোরাজুরি করল লোকটা আমাদেরকে রাজি করানোর জন্য, কিন্তু সিদ্ধান্তে অনড় রইলাম আমরা। সাফ সাফ জানিয়ে দিলাম, রাতের বেলা কিছুতেই নামছি না। ওরা যদি জবরদস্তি করার চেষ্টা করে, স্রেফ গুলি ছুঁড়তে শুরু করব আমরা।

অগত্যা পিছিয়ে গেল মাটুকুরা। রাতের অন্ধকারে লড়াইয়ে নামার ইচ্ছে নেই ওদের কারও। একেবারে অবশ্য চলে গেল না, টিলার চারপাশে, নিরাপদ দূরত্বে ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ড জ্বলে

উঠতে দেখলাম। পাহারা বসানো হয়েছে সবখানে, আমাদের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে, যাতে আচমকা টিলা থেকে নেমে লড়াই বাধাতে না পারি।

উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কেটে গেল সে-রাত। অনিশ্চয়তায় ভুগলাম আমরা সবাই, পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোন্ দিকে মোড় নেবে, তার কিছুই বলা যায় না। ভাগ্য ভাল যে, সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে এসেছিলাম, তাই কাউকে অভুক্ত থাকতে হলো না। শহরে ঢোকার আগে ঝর্ণা থেকে পানি খেয়ে নিয়েও খুব ভাল করেছি। আমার ধারণাই ঠিক, টিলায় কোনও ধরনের জলধারা নেই। এক ফোঁটা পানির অস্তিত্ব নেই ওখানে।

রাতটা বড় দীর্ঘ মনে হলো, তবে বিরতিহীন সময়ের কাছে হার মেনে এক পর্যায়ে সমাপ্তি ঘটল তার। ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই উঠে পড়লাম আমি, ঘুরেফিরে দেখতে শুরু করলাম সঙ্গীদের অবস্থা। আক্রমণের জন্য সবাইকে তৈরি হবার নির্দেশ দিলাম। আশা করছি দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রথম হামলা চালাতে পারব।

বুটিয়ানা যোদ্ধারা খোলা আকাশের তলায় রাত কাটিয়ে কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল রাতভর। বিমর্ষও দেখাল ওদেরকে। যতটা পারলাম, হাঁকডাক ছেড়ে সতেজ করে তুললাম সবাইকে। মনে করিয়ে দিলাম, আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য কী। সফল হলে মাটুকু কুকুরদের সামনে আর কোনোদিন মাথা নত করতে হবে না ওদেরকে। মোটামুটি কাজ হলো এতে। উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরে আসতে দেখলাম যোদ্ধাদের মাঝে।

ভালমত আলো ফুটলে সচকিত হয়ে উঠলাম। পূর্বদিক

থেকে মাটুকু যোদ্ধাদের বিশাল এক বাহিনী এগিয়ে আসছে। টিলার দেড়শো গজ দূরে পৌঁছে থামল ওরা। একটু পর একজন দূত পাঠানো হলো। টিলার গোড়ায় এসে চেঁচিয়ে আমাদেরকে ডাকল সে।

বড় একটা পাথরের উপর উঠে দাঁড়াল বুটিয়ানাদের দলপতি। জানতে চাইল, 'কী চাই?'

'সর্দার ওয়াম্বের বার্তা নিয়ে এসেছি আমি,' বলল দূত। 'এখুনি নেমে এসো টিলা থেকে। আমাদের হাতে তুলে দাও দোষী শিকারী আর সর্দারের বউকে। তা হলে নির্বিবাদে এখান থেকে চলে যাবার সুযোগ দেয়া হবে।'

'আর যদি না দিই?'

'টিলায় বসে থেকে কচুকাটা হতে পারো। সিদ্ধান্ত তোমাদের।'

'কচুকাটা হবার ইচ্ছে নেই আমাদের,' বলল বুটিয়ানা দলপতি। 'কিন্তু এখনও তো সকাল হয়নি ভালমত। কী ঠাণ্ডা পড়েছে, দেখেছ? আমাদের হাত-পা সব জমে আছে। একটু রোদ বাড়তে দাও। কুয়াশা কাটুক, আমরাও একটু শরীর গরম করি। তারপর নাহয় নেমে আসব।'

'না! নামলে এখুনি নামতে হবে!' চেঁচাল দূত।

'হুকুম দিচ্ছ নাকি? আমরা কি তোমার পা-চাটা গোলাম? বলেছি তো, রোদ বাড়লে নেমে আসব। পছন্দ না হলে জাহান্নামে যাও।'

'তা হলে মরার জন্য তৈরি হও!' সরোষে বলল দূত। উল্টো ঘুরে গটমট করে ফিরে গেল দলের কাছে।

চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম আমি। উদ্বিগ্ন চোখে

তাকালাম শহরের পিছনের উঁচু পাহাড়টার দিকে। দু'মাইল দূরে ওটা, ঢালের গা থেকে কুয়াশা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি না। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম, সবকিছু ওদের সময়জ্ঞানের উপর নির্ভর করছে। আক্রমণ শুরু করতে যদি দেরি হয়ে যায়, বিপদে পড়ে যাব আমরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠবে এই টিলা। অথচ যোদ্ধাদের জিভ ভেজানোর মত এক বিন্দু পানি নেই আমাদের কাছে। খরতাপের মধ্যে এখান থেকে লড়াই চালানো স্রেফ অসম্ভব হয়ে পড়বে। যা করার তা করতে হবে রোদ চড়ার আগেই।

পুবাকাশে সূর্য ভালমত হেসে উঠতেই নীচে জড়ো হওয়া মাটুকু যোদ্ধাদের মধ্যে রৈ রৈ রব উঠল। এরপর শোনা গেল সমস্বরে মন্ত্র আওড়ানোর আওয়াজ। সংখ্যায় প্রায় দেড় হাজার ওরা, সম্মিলিত কণ্ঠের কারণে ঢাকা পড়ে গেল আর সব শব্দ। খানিক পরে কয়েকটা গুলি ছোঁড়া হলো আমাদের দিকে। বুঝলাম, একা আমরাই নই, প্রতিপক্ষের হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র আছে। অবশ্য গুলিগুলো কোনও ক্ষতি করতে পারল না আমাদের, মাথার উপর দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্টের মত উড়ে গেল।

হামলা শুরু হতে যাচ্ছে, তার আলামত দেখা গেল নীচে। তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল যোদ্ধারা। একেক ভাগে পাঁচশো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, টিলার তিনদিকে অবস্থান নিল। তারপর একযোগে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে এল আমাদেরকে লক্ষ্য করে। ভালমত আড়াল নিয়েছি আমরা, কাজেই গুলিতে কেউ হতাহত হলাম না। একটু পর গোলাগুলির তোড় খানিকটা কমে এলে একটা পাথরের উপর উঠলাম, টিলার ঢাল আর চারপাশের সমতল এলাকা ভালমত দেখে নেবার ইচ্ছে। চেঁচিয়ে বুটিয়ানাদেরকে

নির্দেশ দিলাম, আমার সঙ্কেত পাবার আগে একটা কার্তুজও যেন অপচয় না করে। গুলি যখন করবে, তা করতে হবে বন্দুক নীচের দিকে ধরে। লোড করার জন্য সময় বেশি নেয়া যাবে না। ভেবেচিন্তেই দিচ্ছি এই নির্দেশ। স্থানীয় এই আদিবাসীদের হাতে বেশিরভাগই পুরনো আমলের গাদা বন্দুক। রেঞ্জ অত্যন্ত কম, এদের হাতের টিপও মোটেই ভাল নয়। অস্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ কার্যকারিতা দেখতে হলে শত্রুকে কাছে পেতে হবে।

আসছে মাটুকুরা। টিলার আশির গজের মধ্যে পৌঁছে গেল বিনা বাধায়। লক্ষ করলাম, সারিবদ্ধভাবে এগোচ্ছে যোদ্ধারা, গায়ে গা ঘেঁষে। তাতে আমাদেরই সুবিধা।

'গুলি করব, মাকুমাজান?' জানতে চাইল বুটিয়ানা দলপতি।

'না,' মাথা নাড়লাম। 'অপেক্ষা করো।'

কমছে দূরত্ব। ষাট গজ... পঞ্চাশ... চল্লিশ... ত্রিশ! আর দেরি করার মানে হয় না। চেঁচিয়ে উঠলাম সর্বশক্তিতে।

'ফায়ার!'

সবার আগে আমি নিজেই ঘোড়া দাবলাম আমার আট বোরের রাইফেলের। আমার উদাহরণ অনুসরণ করল বাকিরা।

বজ্রপাতের মত সম্মিলিত আওয়াজে কেঁপে উঠল পুরো টিলা। বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গেল একের পর এক ছুটতে থাকা গুলিতে। এর ফলাফলও পাওয়া গেল তৎক্ষণাৎ। মাত্র ত্রিশ গজ দূরে ছিল মাটুকুরা, এত কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। প্রথম ধাক্কাতেই সামনের এক সারি যোদ্ধা খতম হয়ে গেল। বাকিরা ছড়িয়ে পড়ল দু'পাশে, উন্মত্তের মত ছোটাছুটি করছে আড়াল পাবার আশায়। দ্বিতীয় দফা গুলিতে আরও একদল ধরাশায়ী হলো। ব্যস, সম্মুখসমরের ইচ্ছে উবে গেল তাদের মাঝ

থেকে। উল্টো ঘুরে পড়িমরি করে ছুটল সবাই। যতক্ষণ ওরা রেঞ্জের মধ্যে থাকল, গুলি চালিয়ে গেলাম আমরা। পিছন থেকে ঘায়েল করলাম একের পর এক শত্রুকে।

এক পর্যায়ে চেঁচিয়ে গুলি থামাবার নির্দেশ দিলাম আমি। শত্রুরা নাগালের বাইরে চলে গেছে, আর গোলাগুলি করে লাভ নেই। বুটিয়ানাদের মাঝে উল্লাসের রোল পড়ল। পঞ্চাশজনের বেশি মাটুকু খতম হয়ে গেছে, অথচ আমাদের একজনও আহত হয়নি। চমৎকার সাফল্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে উদ্বেগে। এখন পর্যন্ত শহরের পিছনে ধোঁয়া উড়তে দেখছি না। হলোটা কী?

পরের আধঘণ্টা কেটে গেল নিরুপদ্রবে। এরপর নতুন কৌশল অবলম্বন করল মাটুকুরা। একযোগে আক্রমণ করার কুফল বুঝতে পেরেছে, তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। ছোট ছোট জটলা হয়ে ছুটে এল আমাদের দিকে। একেক দলে বড়জোর পাঁচ-ছ'জন। টিলার গোড়ার কাছে প্রান্তর এবড়ো-থেবড়ো, মাটির স্বাভাবিক আড়াল ব্যবহার করে এগোচ্ছে ওরা। ঘায়েল করা কঠিন। তারপরেও অনেককেই খতম করলাম, কিন্তু সমস্যা হলো, প্রতিটি শটের জন্য ভাল নিশানার প্রয়োজন হচ্ছে। আমার তাতে অসুবিধে নেই, কিন্তু বুটিয়ানারা কাঁচা বন্দুকবাজ। যত না শত্রুকে ঘায়েল করছে, তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ করছে গুলি। পুরনো আমলের গাদা বন্দুকও লোড করতে প্রচুর সময় লাগছে ওদের। ফলে খুব শীঘ্রি টিলার গোড়ায় শত্রুসংখ্যা বেড়ে চলল।

যা করার, একা আমিই করছি। একের পর এক গুলিতে খতম করছি একেকজন মাটুকুকে। কিন্তু খুব শীঘ্রি আমার দুটো রাইফেলই ভীষণ গরম হয়ে গেল। ধরলেই হাতে ছ্যাঁকা খাচ্ছি।

উপায়ান্তর না দেখে কিছুটা বিরতি দিতে বাধ্য হলাম ওগুলোর ঠাণ্ডা হবার জন্য। সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল মাটুকুরা। হঠাৎ আঁতকে উঠে লক্ষ করলাম, হাজারখানেক যোদ্ধা জড়ো হয়ে গেছে টিলার গোড়ায়। বড় বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে ফেলেছে। ওখান থেকে অঝোর ধারায় গুলি ছুঁড়তে শুরু করল আমাদের দিকে।

আমার দুই কুলি মারা পড়ল গুলির আঘাতে। আরেকজন হলো গুরুতর আহত। বুঝতে পারলাম, বেকায়দায় পড়ে গেছি। টিলার গোড়ায় ভাল কাভার পেয়ে গেছে শত্রুরা। ওদেরকে ঘায়েল করতে পারছি না কিছুতেই। সঙ্গীদের নির্দেশ দিলাম অযথা আর গুলি না ছুঁড়তে। বরং অস্ত্র লোড করে অপেক্ষা করতে বললাম মাটুকুদের জন্য। কথা শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড হুঙ্কার ভেসে এল নীচ থেকে। পরমুহূর্তে পিঁপড়ের মত পিলপিল করে ধেয়ে এল মাটুকু যোদ্ধারা। পাগলের মত টিলার ঢাল বাইছে ওরা, এগোবার গতি অবিশ্বাস্য। এত দ্রুত ওরা উঠে আসতে পারবে, তা ভাবিইনি।

'ফায়ার!' চেঁচিয়ে উঠলাম আবার।

গর্জে উঠল আমাদের সবার অস্ত্র। কাতারে কাতারে অকাতরে ঢলে পড়তে শুরু করল মাটুকুরা, কিন্তু দমল না। মরিয়া হয়ে হামলা চালাচ্ছে ওরা, কিছুতেই ওদের গতি রুদ্ধ হবে না। সামনের জন মারা পড়লে পিছনের জন তাকে টপকে এগোতে থাকল, উন্মত্তের মত গুলি ছুঁড়তে থাকল আমাদের দিকে। খুব শীঘ্রি ওরা পৌছে গেল আমাদের প্রতিরক্ষা-ব্যূহের প্রথম সীমানায়।

শুরু হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। এত কাছ থেকে গুলি করার,

কিংবা গুলি করার পর আবার অস্ত্র রিলোড করার সুযোগ নেই। তাই আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে দিয়ে কোমরের খাপ থেকে অ্যাসেগাই বের করে আনল বুটিয়ানারা, ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপরে। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছি আমরা। বিপুল বিক্রমে বুটিয়ানারা বহু মাটুকুকে খতম করল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হলো। উপর থেকে ওদেরকে কোনও সাহায্য করতে পারলাম না বাকিরা। গুলি করলে আমাদের নিজস্ব লোকই জখম হবার সম্ভাবনা আছে।

ওখানে অবস্থান নেয়া আমাদের বেশিরভাগ যোদ্ধাই মারা পড়ল। যারা বাঁচল, তারা কোনোক্রমে ছুটে এসে আশ্রয় নিল দ্বিতীয় ব্যূহের ভিতরে। ওখানে সংখ্যায় কিছুটা বেশি আছি আমরা, আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নিতে কিছুটা সময়ও পেয়েছি। প্রথম ব্যূহ ধ্বংস করে দিয়ে মাটুকুরা যখন আমাদের দিকে এগিয়ে এল, শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললাম আমরা। প্রাণপণে ঠেকাতে শুরু করলাম ওদেরকে। নাগালের মধ্যে এলেই গুলি কিংবা বর্শার আঘাতে খতম করে দিচ্ছি।

টিলার গায়ে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠছে লাশের স্তূপ, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে কোনও সন্তুষ্টি অনুভব করলাম না। লোকসংখ্যা কমছে আমাদের, সেইসঙ্গে ক্লান্তও হয়ে পড়ছি। অন্যদিকে নীচ থেকে নিত্যনতুন সৈন্য এসে যোগ দিচ্ছে মাটুকু বাহিনীতে, নিহত সঙ্গীদের জায়গা পূরণ করার জন্য। হৈচৈ করে সবাইকে উৎসাহ দিয়ে চলেছি আমি, কিন্তু ওতে কতটুকুই বা আর কাজ হয়! বুঝতে পারছি, পরাজয় নিশ্চিত। আফ্রিকার এই নামহীন টিলাতেই শেষ শয্যা নিতে হবে সবাইকে।

আক্রমণের তোড় অসহনীয় হয়ে উঠলে ঠিক করলাম পিছু

হটব, আশ্রয় নেব টিলার গুহাগুলোতে। ওখানেই লড়াই করতে করতে বীরের মত মরব। কিন্তু আদেশটা দেবার সময় পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম গতকালের সেই মাটুকু যোদ্ধাকে। একটা বর্শা বাগিয়ে ছুটে আসছে আমার দিকে। মুখ দিয়ে ছুটছে গালাগালির তুবড়ি। এঁফোড়-ওঁফোড় হয়ে যেতাম বর্শার আঘাতে, কোনোমতে ঝাঁপ দিয়ে সরে গেলাম ফলার সামনে থেকে। মাটিতে পড়েই একটা গড়ান খেলাম, তার মাঝে কোমরের হোলস্টার থেকে বের করে আনলাম রিভলভার। লোকটা আমার দিকে ফিরতেই শান্তভাবে গুলি করলাম ওর বুকে। ঝাঁকি খেল তার দেহ, হুড়মুড় করে পড়ে গেল ঢালের গায়ে।

যা হোক, আমাদের তখন শেষ দশা। নিশ্চিত পরাজয় মেনে নিয়েছে অনেকেই। আমার চোখের সামনেই এক বুটিয়ানা যোদ্ধাকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে দেখলাম, যদিও তাতে কোনও লাভ হলো না। তার বুকে বর্শা গেঁথে দিল মাটুকুরা। আমার কপালেও তা-ই ঘটবে ভাবছি, হঠাৎ শোরগোল উঠল শত্রুদের মাঝে।

'পাহাড়ের দিকে... পাহাড়ের দিকে তাকাও! একদল যোদ্ধা নেমে আসছে ওখান দিয়ে!'

ঘাড় ফিরিয়ে ওদিকে তাকালাম। কথাটা সত্যি, দেরিতে হলেও এসে গেছে সাহায্য। পাহাড়ের ঢাল ধরে দুই সারিতে সবেগে নেমে আসছে সর্দার নালার বাহিনী। শহরের প্রথম প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। রোদ পড়ে চকচক করে উঠছে ওদের শত-সহস্র বর্শা। পরে জানতে পেরেছিলাম ওদের দেরির কারণ। পথে নাকি একটা নদী পড়েছিল, বছরের এ-সময়ে ওটা শুকনো থাকার কথা, অথচ ছিল না। প্রমত্তা স্রোত বইছিল। তাই

ভিন্ন পথে এগোতে গিয়ে বহু সময় লেগে গেছে ওদের, ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারেনি পাহাড়ের পিছনে। আমরা ওদের দেখা পাবার খানিক আগে পৌঁছেছে, এসেই দেখতে পেয়েছে আমাদের লড়াই, তাই সময় নষ্ট করে ছুটে এসেছে সাহায্য করতে। আগুন-টাগুন জ্বালাবার সময় পায়নি। সরাসরি আক্রমণই এখন ওদের ভরসা।

বুটিয়ানা বাহিনীকে শহরের লোকজনও দেখতে পেয়েছে। সশস্ত্র মাটুকু যোদ্ধাদেরকে ছুটে যেতে দেখলাম পাহাড়ি ঢালের দিকে—আগ্রাসী বাহিনীকে ঠেকাতে চাইছে ওরা। প্রথম প্রাচীরে প্রতিরোধ গড়ার সুযোগ পেল না ওরা, নালার বাহিনী খুব সহজেই ওটাকে পরাস্ত করে ঢুকে পড়ল শহরের সীমানায়। দ্বিতীয় প্রাচীরের উপর অবস্থান নিল মাটুকুরা, শুরু হয়ে গেল দুই পক্ষের মধ্যে গুলি আর বর্শা বিনিময়।

শহরের দুই ফটকের দিকে নজর ফেরালাম আমি। দলে দলে নারী-শিশু জমায়েত হচ্ছে ওখানে। ভয়াল যুদ্ধের মাঝে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চাইছে ওরা, পালিয়ে গিয়ে সম্ভবত পাহাড়ি গুহা-টুহায় আশ্রয় নেবে।

এদিকে টিলার যুদ্ধেরও মোড় ঘুরে গেল। বুটিয়ানাদের মূল বাহিনীকে উদয় হতে দেখে চমকে গেছে আমাদের উপর হামলা চালানো মাটুকু যোদ্ধারা। শহরকে পিছন থেকে আক্রান্ত হতে দেখে ঘাবড়ে গেছে ওরা, বুঝতে পারছে—টিলার অল্প-ক'জন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে কোনও লাভ হবে না। আসল লড়াইটা হচ্ছে শহরের পিছনে। ওখানেই যাবার ইচ্ছে জেগে উঠল ওদের ভিতর, আগ্রহ হারিয়ে ফেলল আমাদের সঙ্গে লড়াই করবার। দলে দলে টিলা থেকে নামতে শুরু করল ওরা, ছুটে যাচ্ছে নতুন

রণক্ষেত্রে। খুব শীঘ্রি দেখা গেল, নিহত কিংবা গুরুতর আহত ছাড়া আর একজন মাটুকুও নেই আমাদের আশপাশে। পিছন থেকে হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে ঘায়েল করলাম আমরা, তবে ওদেরকে ধাওয়া করলাম না। যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছি আমরা, আগে বুঝে নেয়া দরকার—কতজন অবশিষ্ট আছি, গোলাবারুদই বা কতটুকু আছে আমাদের সঙ্গে। সে-অনুসারে নতুনভাবে পরিকল্পনা সাজাতে হবে।

মাটুকুরা চলে গেলে দলের সমস্ত লোককে একত্র করলাম আমি। হিসেব করে দেখা গেল, মোট একান্নজনকে হারিয়েছি আমরা—মারা গেছে, কিংবা মারাত্মক জখম হয়েছে এরা। আর যুদ্ধ করতে পারবে না। মাটুকুরা মরেছে আরও বেশি, তবে ওদের লাশ গোনার কোনও মানে হয় না। রান্নার পাত্রে জমানো পানি নিয়ে আসতে বললাম, তা দিয়ে কোনোমতে মুখ ভেজালাম সবাই। আহতদের সেবা-শুশ্রূষার নির্দেশ দিয়ে চোখ ফেরালাম যুদ্ধের অগ্রগতি দেখতে।

প্রথম প্রাচীর পেরিয়ে দ্বিতীয় প্রাচীরের কাছে চলে এসেছে নালার বাহিনী। সারিবদ্ধভাবে এগোচ্ছে ওরা, মুখে গাইছে যুদ্ধসঙ্গীত। প্রাচীরের একেকটা অংশের কাছে এসে জোট বাঁধে ওরা, একযোগে হামলা করে। প্রাচীরের গা বেয়ে উপরে উঠে যেতে দেখি ওদেরকে, ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখি অন্যপাশে। প্রতিটি আক্রমণ যে সফল হচ্ছে, তা না। কখনও জিতছে, কখনও হারছে ওরা। সংখ্যা কমছে ধীরে ধীরে।

যুদ্ধের ভয়াবহ আরেকটা দিক হলো শিকারী কুকুর। মাঝে মাঝেই আগ্রাসী বাহিনীর দিকে ভয়ানক প্রাণীগুলোকে ছেড়ে দিতে দেখলাম। কুকুরগুলো মারা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু মরার আগে

আঁচড়ে কামড়ে আহত করছে একাধিক বুটিয়ানাকে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গলার টুঁটিও ছিঁড়ে ফেলছে। এতকিছুর পরও অদম্য নালার বাহিনী। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার প্রত্যয় নিয়ে এসেছে ওরা। কিছুতেই হাল ছাড়ছে না। এর ফলাফলও মিলল। খুব শীঘ্রি পতন ঘটল দ্বিতীয় দেয়ালের।

এবার শহরের মূল অংশে হামলা চালাবার পালা। ওখানে জড়ো হয়েছে প্রায় দু'হাজার মাটুকু যোদ্ধা। সুবিধেজনক অবস্থানে আছে ওরা, বুটিয়ানা বাহিনী ভিতরে পা রাখতেই প্রবল আক্রোশে পাল্টা আক্রমণ চালাল। দেখতে পেলাম, নিজস্ব এলাকায় কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে ওরা। কিছুতেই ওদেরকে পরাস্ত করতে পারল না বুটিয়ানারা। বরং লাশের পাহাড় ফেলে পিছু হটতে বাধ্য হলো।

পরিষ্কার হয়ে গেল, এভাবে কোনও সুবিধে করতে পারবে না নালার সৈন্যরা। ওদের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে শহরের মাটুকু যোদ্ধারা। প্রতিবারের আক্রমণে শুধু লোকবল হারাবে নালা, কাজের কাজ হবে না কিছুই। ভেবে দেখলাম, মনোযোগ নষ্ট করতে হবে মাটুকুদের। যদি একটা ডাইভারশন সৃষ্টি করতে পারি, হয়তো বা সফল আক্রমণ চালাতে পারবে আমাদের বাহিনী।

আমাদের ছোট্ট দলের দলপতিতে ডাকলাম। জানালাম কী করতে চাই। লোকটা খাঁটি সৈনিক, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে রাজি হয়ে গেল ঝুঁকি নিতে। দলের সুস্থ যোদ্ধাদেরকে একত্র করা হলো। আহতদের রেখে গেলাম কুলিদের তত্ত্বাবধানে। ওরা সেবা-শুশ্রূষা করবে। বাকিরা টিলার ঢাল বেয়ে নেমে এলাম নীচে। শহরের বাড়িঘর আর আমাদের মাঝে প্রায় সাত-আটশো

গজ ফাঁকা জায়গা, পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে এগোতে হচ্ছে আমাদেরকে। কিন্তু কপাল ভাল, বুটিয়ানা বাহিনীর দিকে নজর সবার, পিছনে কেউ তাকাচ্ছে না। সহজেই ফাঁকা এলাকাটা পেরিয়ে এলাম আমরা। পৌঁছে গেলাম শহরের আবাসিক এলাকায়।

বড় একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে ওটা দখল করলাম আমরা। নামেই দখল—ভিতরে কেউ নেই। যুদ্ধ শুরু হতেই পালিয়ে গেছে। ওই বাড়ির ভিতরে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নিলাম সবাই, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে নিলাম নিজেদের। তারপর একযোগে বেরিয়ে এলাম, পিছন থেকে হামলা করলাম শহর-রক্ষায় ব্যস্ত মাটুকুদের উপর। প্রথমে গুলি ছোঁড়া হলো, তারপর নাঙ্গা অ্যাসেগাই বাগিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের দলটা। কারও সঙ্গে ঢাল নেই, এ-অবস্থায় এমন আক্রমণ খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই আমাদের হাতে। মাটুকুদের মনোযোগ ফেরাতে না পারলে জয়ের আশা ছেড়ে দিতে হবে।

কী আর বলব, আমার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আজও গর্ব হয়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। একটাই সুযোগ আমাদের জন্য—এবারই যা করার করতে হবে। দ্বিতীয়বার মাটুকুদের মনোযোগ ফেরানোর সুযোগ পাওয়া যাবে না। কথাটা জানা আছে সবার। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে লড়াই বাধিয়ে দিল ওরা। প্রায় একই সঙ্গে সামনে থেকে ভেসে এল মূল বুটিয়ানা বাহিনীর যুদ্ধসঙ্গীত। পিল পিল করে ছুটে এল ওরা। মাটুকু সৈন্যরা দ্বিমুখী এই আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুন হয়ে গেল অনেকে। খানিক

পরে নিজেদের গুছিয়ে নিল বটে, তবে তখন দেরি হয়ে গেছে, বুটিয়ানাদের আক্রমণের তোড়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো তারা, এক পর্যায়ে পারল না আর সংঘবদ্ধ থাকতে।

উন্মত্ত চিৎকার আর অস্ত্রের ঝনঝনানিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল দিগ্বিদিক, ছত্রভঙ্গ মাটুকুরা ঠিকমত প্রতিরোধ গড়তে পারল না, তার আগেই একেকজনের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল কয়েকজন করে বুটিয়ানা। চোখের পলকে অনেকের ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেল, বুক থেকে বইল রক্তের ধারা। ভয়ানক লড়াই বেধে গেল। প্রাথমিক আঘাতটা সামলে পাল্টা আক্রমণ করার প্রয়াস চালাল মাটুকু-বাহিনী, কিন্তু ততক্ষণে সীমানা পেরিয়ে অনেকখানি ভিতরে ঢুকে গেছে তাদের প্রতিপক্ষ। বুটিয়ানাদের প্রাণহানিও ঘটেছে প্রচুর, তবে তা মাটুকুদের জয়ের জন্য অপ্রতুল।

লড়াই আমিও করলাম, তবে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে নয়। ওসবে অভ্যস্ত নই আমি। সুবিধেজনক একটা জায়গা বেছে নিয়ে রাইফেল আর রিভলভার থেকে প্রাণঘাতী বুলেট ছুঁড়ে চললাম। নিজের কোনও কৃতিত্ব দাবি করব না সেই লড়াইয়ে, তবে এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, যে-কোনও বুটিয়ানা যোদ্ধার চেয়ে বেশি মাটুকুকে ঘায়েল করেছি আমি সেদিন।

যা হোক, ধীরে ধীরে লড়াইয়ে জয় হতে থাকল বুটিয়ানাদের। চারদিক থেকে ভেসে আসতে শুরু করল উল্লাসধ্বনি। মাইওয়াকে চকিতের জন্য দেখতে পেলাম প্রাচীরের উপর। হাতে একটা রক্তাক্ত অ্যাসেগাই ধরে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্রমূর্তিতে। চেঁচিয়ে সাহস জোগাচ্ছে নিজের বাহিনীকে, একই সঙ্গে গালাগাল দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে ওয়াম্বে আর তার যোদ্ধাদের।

শেষ একটা চেষ্টা চালাল মাটুকুরা। একত্রিত হয়ে পাল্টা

হামলা চালাল মরিয়া হয়ে। কিন্তু তৈরি ছিল বুটিয়ানা-বাহিনী। অনায়াসে ঠেকাল ওদের আক্রমণ, ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবেলা করল ওদেরকে, এখানে ওখানে ছিটকে পড়তে থাকল পরাস্ত যোদ্ধাদের লাশ। আহতদের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

লাফ দিয়ে প্রাচীর থেকে নামতে দেখলাম মাইওয়াকে। হাতের অ্যাসেগাই বাগিয়ে ছুটে গেল যুদ্ধের মাঝে। ওর সেই রণাঙ্গিণী মূর্তি দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। চোখের সামনে যে-মাটুকুকেই পেল, তাকেই ঘায়েল করতে থাকল মেয়েটা অ্যাসেগাই চালিয়ে। কী তার আক্রোশ, কেউ পেরেই উঠল না ওর সঙ্গে। সামান্য এক নারীর এই রুদ্রতা দেখে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল বুটিয়ানারা। হৈ-হল্লা করে হামলা করল মাটুকুদের উপরে।

লড়াইটার সমাপ্তি ঘটল ওখানেই। একের পর এক সঙ্গীসাথীর মৃত্যু দেখে লড়বার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল মাটুকু যোদ্ধারা। উল্টো ঘুরে পিঠটান দিল তারা। ওদেরকে ধাওয়া করে শহরের বাইরে নিয়ে গেল বুটিয়ানারা।

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল অস্ত্রের ঝনঝনানি। যুদ্ধে জয় হয়েছে আমাদের। ধপ্ করে বসে পড়লাম মাটিতে। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলাম। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানালাম স্রষ্টাকে এখনও বেঁচে আছি বলে। সত্যি বলতে কী, অসম এই লড়াইয়ে জিততে পারব, এমনটা আশা করিনি মোটেই। স্রেফ বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য জেদের বশে যোগ দিয়েছিলাম বুটিয়ানাদের সঙ্গে।

বিশ মিনিট পর ফিরতে দেখলাম নালার যোদ্ধাদেরকে। ওরা এসে জানাল, পাহাড়ি গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে অবশিষ্ট মাটুকুরা।

ওখানে ওদেরকে তাড়া করা নিরাপদ নয়। তার কোনও প্রয়োজনও নেই অবশ্য। শহর এখন আমাদের দখলে।

খুব ক্লান্তি অনুভব করলাম খবরটা শোনার পর। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন শরীরের সমস্ত শক্তি উবে গেছে। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ মুদলাম। হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল আমার গায়ে, পরমুহূর্তে আমার নাম ধরে ডাকল কে যেন। দৃষ্টি মেলে সর্দার নালাকে দেখতে পেলাম সামনে। হাতে একটা বর্শার ক্ষত, রক্ত ঝরছে। তবে আঘাতটা খুব গুরুতর নয়। মাইওয়াও দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। হাঁপাচ্ছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ। চেহারায় গর্বের ছাপ, একই সঙ্গে প্রতিহিংসা খেলা করছে।

'শত্রুরা পালিয়ে গেছে, মাকুমাজান,' বলল নালা। 'ওদের নিয়ে আর কোনও ভয় নেই। কিন্তু ওয়াম্বে কোথায়? আর তোমার বন্ধু... সেই সাদা বন্দিকেই বা দেখছি না কেন?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকালাম। 'কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।'

আমাদের কাছেই মাটিতে পড়ে আছে এক আহত মাটুকু। উরুতে বিশাল এক ক্ষত, তার কারণে পালাতে পারেনি। পড়ে পড়ে ককাচ্ছে। একটা বর্শা নিয়ে তার গলায় ঠেকাল নালা।

'কথা বল্, কুত্তা!' রাগী গলায় বলল সর্দার। 'তোদের সর্দার ওয়াম্বে কোথায়? যুদ্ধের ময়দানে ছিল না সে? জবাব দে, নইলে এখুনি খুন করব তোকে।'

'আমাকে ক্ষমা করে দিন, প্রভু,' কাতর গলায় বলল যোদ্ধা। 'সর্দারের খবর জানি না আমি। লড়াইয়ের সময় ছিল না সে, এটুকু বলতে পারি। যুদ্ধ-টুদ্ধ করার মুরোদ নেই তার। খুঁজে দেখুন... হয়তো বা তার বাড়ির ভিতর, কিংবা বাড়ির পিছনের

পাহাড়ি গুহায় ঘাপটি মেরেছে।'

লোকটার নির্দেশনা অনুসারে ঘাড় ফেরালাম। আমাদের কাছ থেকে মোটামুটি চারশো গজ দূরে, পাহাড়ি ঢালের গোড়ায় একটা প্রাচীর ঘেরা বাসস্থান দেখা যাচ্ছে। বোঝা গেল, ওটাই ওয়াম্বের বাড়ি। পিছনের ঢালে মুখ ব্যাদান করে রেখেছে বড় এক গুহামুখ।

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল নালা। তাকাল আমার দিকে। 'চলো, মাকুমাজান, দেখে আসি হারামজাদা ওখানে আছে কি না।'

নিজের সৈন্যদের ডেকে পাঠাল সে।

আট

মাইওয়ার প্রতিশোধ

উল্লাসরত বুটিয়ানা যোদ্ধাদেরকে একত্রিত করা হলো। যুদ্ধশেষে তিনভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে ওদের সংখ্যা। দুইশ' লোককে আলাদা করল নালা, আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করবে তারা। আমার অনুরোধে নির্দেশ দেয়া হলো—আহত শত্রুসেনা, সেই সঙ্গে শহরে আটকে পড়া নারী-শিশুদেরকে কোনও অবস্থাতেই হত্যা করা চলবে না। বরং সবার কাছে বার্তা পাঠাতে হবে, চাইলে জ্ঞাতি ভাইদের সাহায্য করতে পারে ওরা নির্ভয়ে। নালার বিরোধ ওয়াম্বের সঙ্গে, পুরো মাটুকু জাতির সঙ্গে নয়।

এরপর শ'চারেক যোদ্ধা নিয়ে মাটুকু সর্দারের আবাসের দিকে

রওনা হলাম আমরা। আগেই বলেছি, পাহাড়ের গোড়ায় ওটার অবস্থান—প্রায় দেড় একর জায়গার মধ্যে গড়ে উঠেছে মূল প্রাসাদ আর চারপাশের আরও ক'টা বাড়ি। নিচু একটা দেয়াল আছে সীমানায়, ভিতরে অর্ধচন্দ্রাকৃতির মত সাজে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো। মাঝখানেরটায় সর্দার নিজে থাকে, বাকিগুলো তার একেকজন স্ত্রীর জন্য।

জায়গাটার প্রতিটি ইঞ্চি মাইওয়ার নখদর্পণে, আমাদেরকে সরাসরি প্রবেশপথের সামনে নিয়ে গেল। ওখান থেকে ভিতরে উঁকি দিলাম, জনমনিষ্যির সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সবগুলো ঘর খালি, কড়া রোদে তেতে আছে উঠান। কোথাও কেউ নেই।

'শেয়ালটা গর্তে ঢুকে পড়েছে,' বলল মাইওয়া। 'ওই যে, ওই গুহার ভিতরে গা ঢাকা দিয়েছে ও, কোনও সন্দেহ নেই।'

হাত উঁচু করে সর্দারের বিশাল বাড়ি আর পিছনের ঢালের গুহামুখ দেখাল ও। কথাটা শুনেও যেন শুনলাম না আমি। দৃষ্টি আঠার মত সেঁটে আছে সর্দারের বাড়ির সীমানায়। মাইওয়ার কথা সত্যি, খাঁটি আইভরি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটার সীমানা-প্রাচীর। বিশাল বিশাল অনেকগুলো হাতির দাঁত গেঁথে রাখা হয়েছে মাটিতে। সবচেয়ে ছোটগুলো... মানে তুলনামূলকভাবে আর কী... বসানো হয়েছে পাহাড়ের গা ঘেঁষে। ক্রমান্বয়ে ওগুলোর পরে বসানো হয়েছে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর দাঁত, সবশেষে অতিকায় দুটো দাঁত এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে ওগুলোর ডগাদুটো পরস্পরকে স্পর্শ করে। উল্টো করে রাখা ইংরেজি *ভি* বর্ণের মত একটা আকৃতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে—সেটাই বাড়ির প্রবেশ ফটক।

চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে

পড়লাম। আমার মত যে-কোনও হাতি শিকারীই হবে। চোখের সামনে বাছাই-করা পাঁচ-ছয়শো আইভরি পড়ে আছে, শুধু তুলে নেয়ার অপেক্ষা। অবশ্য ওগুলো হলো ব্ল্যাক আইভরি... মানে বছরের পর বছর রোদ-বৃষ্টির অত্যাচারে বাইরের অংশ কালো হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। উপরের স্তরগুলো চেঁছে ফেলে দেবার পরেও অনেকটুকুই থেকে যাবে। পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে গেলাম ক্ষণিকের জন্য, আনন্দের আতিশয্যে ছুটে গেলাম ওগুলোর দিকে। হাতে ছুরি বের করে নিয়েছি, দাঁতগুলোর গা খুঁচিয়ে বোঝার চেষ্টা করব, বাইরের কতখানি নষ্ট হয়েছে কালের প্রবাহে।

শীঘ্রি টের পেলাম, কালো আবরণটা খুবই পাতলা। ছুরির সামান্য খোঁচাতেই বেরিয়ে আসছে খাঁটি আইভরির সফেদ দ্যুতি। আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কানে ভেসে এল চাপা এক আর্তনাদ। সাহায্য চাইছে কেউ।

'বাঁচাও!' সিসুটু ভাষায় বলে উঠল কণ্ঠটা। আওয়াজ ভেসে আসছে সর্দারের বাড়ির পিছন থেকে। 'আমাকে মেরে ফেলছে ওরা!'

সচকিত হয়ে উঠলাম। এ কণ্ঠ আমার চেনা। জন এভারির গলা ওটা। লজ্জায় ছেয়ে গেল অন্তর। আইভরি দেখে ভুলে গিয়েছিলাম বন্ধুর কথা... কী স্বার্থপর আমি! আমার এ-আচরণের কারণে হয়তো প্রাণ যাচ্ছে ওর।

নালা, মাইওয়া আর সৈন্যরা এগিয়ে এসেছে আমার পিছু পিছু। ওরাও শুনতে পেয়েছে এভারির আর্তনাদ।

'এদিকে!' উত্তেজিত গলায় বলে উঠল মাইওয়া।

ওর পিছু পিছু ছুট লাগালাম আমরা। ওয়াম্বের বাড়ির পাশ

ঘুরে চলে গেলাম পিছনে। পাহাড়ি ঢালের গায়ে বড় একটা গুহামুখ দেখতে পেলাম, ভিতরটা প্রায়ান্ধকার। আমাদের জন্য শত্রুরা ওঁৎ পেতে আছে কি না কে জানে, কিন্তু সেসব যাচাই করার সুযোগ নেই। ঝড়ের বেগে গুহায় ঢুকে পড়লাম আমরা। কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। আবছা আলোটা চোখে সয়ে এলে দেখতে পেলাম কী ঘটছে ওখানে।

গুহার মাঝখানটায় কাঠের পেরেক দিয়ে মেলে রাখা হয়েছে একটা শক্তিশালী সিংহ-মারার ফাঁদ। আলোকস্বল্পতার মাঝেও ঝকঝক করছে ওটার দুই চোয়ালের ধারালো দাঁতগুলো। ফাঁদের পাশে চলছে ধস্তাধস্তি। বুক-পর্যন্ত দাড়িঅলা প্রায়-উলঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষকে জবরদস্তি করে ওটার কাছে নিয়ে যাচ্ছে ছ'সাতজন মাটুকু নারী, চেষ্টা করছে ভিতরে ফেলে দেবার। একজন মাত্র পুরুষ রয়েছে ওখানে—মোটাসোটা, মাঝবয়েসী, আলকাতরার মত কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। চেহারায় জান্তব নিষ্ঠুরতা। ফাঁদের হাতলে হাত রেখে বসে আছে সে, মেয়েরা বন্দিকে ভিতরে ছুঁড়ে ফেলামাত্র বন্ধ করে দেবে চোয়ালদুটো। কেউ বলে না দিলেও চিনে ফেললাম এই কালো শয়তানকে। ওয়াম্বে... মাটুকুদের নেতা।

আমাদেরকে গুহায় ঢুকতে দেখেই থমকে গেল লোকটা। কয়েক মুহূর্তের জন্য মূর্তির মত স্থির হয়ে গেলাম সবাই, তারপরেই বিদ্যুৎ খেলে গেল মাইওয়ার শরীরে। অ্যাসেগাই বাগিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত আগে বাড়ল ও। সর্বশক্তিতে ফলা ঘোরাল ওয়াম্বের ঘাড় লক্ষ্য করে—এক কোপে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে ফেলতে চায়। কোনোমতে ঝাঁপ দিয়ে একপাশে সরে গেল ওয়াম্বে, কিন্তু পুরোপুরি রক্ষা পেল না তাতে। পায়ে পা

বেধে গেল তার, হুড়মুড় করে পড়ে গেল সিংহের ফাঁদের ভিতর। সঙ্গে সঙ্গে খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল দুই চোয়াল, ধারালো দাঁতে এঁফোড়-ওফোঁড় হয়ে গেল মাটুকু সর্দারের পেট আর পিঠ।

ভয়াবহ এক আর্তচিৎকার বেরুল ওয়াম্বের গলা দিয়ে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস... এতদিন যেভাবে অন্যদের খুন করেছে, ঠিক সেভাবেই আজ মরতে চলেছে সে। কপাল আরও খারাপ, দাঁতগুলো ঢুকেছে পেটে... বুকে নয়। বুকে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত, কিন্তু এখনকার মৃত্যু হবে ধীর গতিতে; কষ্ট পেয়ে তিলে তিলে মারা যাবে সে।

ওয়াম্বের দিকে তখন অবশ্য আর তাকাচ্ছে না মাইওয়া, সর্দারকে ফাঁদের ভিতরে ফেলে দিয়েই জন এভারির দিকে ফিরল, অ্যাসেগাই নিয়ে হামলা করল ওকে আটকে রাখা মেয়েগুলোর উপরে। ধারালো ফলার আঘাতে একটা মেয়ের হাত দু'টুকরো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে এভারিকে ছেড়ে দিল বাকিরা, ছুট লাগাবার চেষ্টা করল গুহামুখের দিকে।

'খতম করো ডাইনিগুলোকে!' গমগম করে উঠল সর্দার নালার গলা।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল এভারি। ছাড়া পেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে ও। হাঁপাচ্ছে। 'কিছু কোরো না। ওদের কোনও দোষ নেই। ওয়াম্বের হুকুম তামিল করছিল কেবল।'

একসঙ্গে সবাই মাথা ঘোরালাম ফাঁদে আটকা পড়া মাটুকু সর্দারের দিকে। এখন অবশ্য আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না তাকে। তীব্র ব্যথায় চেহারা কুঁচকে গেছে তার, ককাচ্ছে করুণ ভঙ্গিতে। লোকটার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল মাইওয়া। ঘামে ভেজা সুন্দর মুখে কাঠিন্য ভর করেছে, দু'চোখে জ্বলছে নীরব আগুন।

'বল্ শয়তান, কে আমি?' বলল ও। 'তোর অসহায় স্ত্রী, যার সন্তানকে নির্মমভাবে খুন করেছিলি... নাকি কোনও প্রতিহিংসার দূত, যে তোর মৃত্যু নিয়ে এসেছে?'

জবাব দিল না ওয়াম্বে। ব্যথায় তড়পাচ্ছে সে।

কোমরের থলে থেকে কাটা হাতটা বের করল মাইওয়া। বলে চলল, 'কী এটা? বাচ্চার হাত? কেন কাটা হয়েছে এটা? কার শরীর থেকেই বা কাটা হয়েছে? সত্যিই এটা মৃত এক হাত, নাকি মৃত্যুর প্রতীক... যা তোর শ্বাস কেড়ে নেবে?

'কোথায় তোর যোদ্ধারা, ওয়াম্বে? খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, নাকি শীতের ঝরা পাতার মত ওরাও ঝরে গেছে? কী মনে হয় তোর, যুদ্ধে জিততে পেরেছিস?'

গোঙানি বেরুল ওয়াম্বের গলা দিয়ে। চোখ উল্টে ফেলছে।

ভাবান্তর হলো না মাইওয়ার মাঝে। কঠিন কথাগুলো বলে যাচ্ছে ও।

'তুই কি এখনও সর্দার আছিস, ওয়াম্বে? নাকি তোর ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির অবসান ঘটেছে... সব হারিয়েছিস তোর চিরশত্রুর হাতে? ওখানেই বা কী করছিস? সিংহের ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়েছিস কেন?

'দুঃস্বপ্ন দেখছিস না তো, মহাশক্তিমান সর্দার?' কাটা হাতটা ওয়াম্বের মুখের সামনে নাড়ল মাইওয়া। 'নাকি পুরোটাই ভয়ানক বাস্তব? তবে কি এক নারীর প্রতিহিংসা তোর নাগাল পেয়ে গেছে? নারীর বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়েছে তোর একনায়কত্ব? দেখ্ নিজের অবস্থা! তিলে তিলে কষ্ট পেয়ে মরবি এবার! নিষ্পাপ শিশুদের খুনির কপালে এরচেয়ে ভাল কিছু ঘটতে পারে না!'

কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মেয়েটা। কাঁপতে

কাঁপতে কাটা হাতটা দিয়ে আঘাত করল ওয়াম্বের গালে, পরমুহূর্তে চিৎকার করে নিজেই অজ্ঞান হয়ে গেল। মাটুকু সর্দারের দিকে তাকিয়ে আচমকা খুব মায়া হলো। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বেচারার চেহারা, সমস্ত রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। দু'চোখের তারায় সীমাহীন আতঙ্ক।

দৃশ্যটা আর সহ্য করতে পারলাম না।

'নালা,' বললাম আমি, 'এভাবে আর চলতে পারে না। হতে পারে ও অপরাধী, তাই বলে এমন কষ্টের মৃত্যু প্রাপ্য নয় কারও। বের করে আনো ওকে ফাঁদ থেকে।'

'না!' দৃঢ় গলায় বলল বুটিয়ানা সর্দার। 'এতদিন সবাইকে যেভাবে কষ্ট দিয়েছে, সেই কষ্ট এবার ও নিজেই ভোগ করুক। শুধু মৃত্যু এলে মুক্তি পাবে ও, তার আগে নয়।'

'তা হলে মৃত্যুই উপহার দাও। দ্রুত মৃত্যু... করুণার মৃত্যু। ও অমানুষ হতে পারে, তুমি তো নও।'

আমার এই কথায় অত্যন্ত প্রভাবিত হলো নালা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বেশ মাকুমাজান, তোমার ইচ্ছে মেনে নিচ্ছি আমি।' সৈনিকদের দিকে ফিরল। 'তার আগে সাদা বন্দি আর আমার মেয়েকে বাইরে নিয়ে যাও।'

ধরাধরি করে এভারি আর মাইওয়াকে গুহা থেকে বের করে আনল বুটিয়ানা যোদ্ধারা। ওদেরকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন পিছন থেকে হাউমাউ করে উঠল ওয়াম্বে। ক্ষমা চাইল এভারির কাছে, অনুরোধ করল ওকে বাঁচাবার জন্য। মৃত্যুর কাছে এসে বুঝি এভাবেই বদলে যায় মানুষ। যাকে খানিক আগে খুন করতে যাচ্ছিল, তার কাছে সাহায্য চাইছে লোকটা। একদা দুর্দমনীয় মাটুকু সর্দার পরিণত হয়েছে সাধারণ এক মানুষে,

যে-কোনও মূল্যে যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়। বলা বাহুল্য, তার এ-অনুনয়ে মোটেই কান দিল না এভারি।

ওদের পিছু পিছু গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। কয়েক মিনিট পর ভিতর থেকে ভেসে এল ওয়াম্বের শেষ চিৎকার—অ্যাসেগাইয়ের আঘাতে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে তার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, জলজ্যান্ত এক অভিশাপের হাত থেকে মুক্তি পেল বুটিয়ানারা। মনোযোগ দিলাম আমার বন্ধুর দিকে।

কী চেহারা হয়েছে এভারির! বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে কেবল, অথচ দেখাচ্ছে ষাট-সত্তর বছরের বৃদ্ধের মত। শীর্ণ শরীরের চামড়ায় পড়ে গেছে বলিরেখা। চোখ বসে গেছে কোটরে, চোয়াল ভেঙে গেছে, বেরিয়ে এসেছে বুকের হাড়। উন্মুক্ত শরীরের এখানে-ওখানে হাজারো ক্ষতের দাগ—গত সাত বছর তার উপর নিয়মিত অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে ওয়াম্বে... স্রেফ নিজের মনোরঞ্জনের জন্য।

ধাতস্থ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসল এভারি, কেঁদে ফেলল মুক্তির আনন্দে। জড়িয়ে ধরল আমাকে, পারলে পা ছোঁয় আর কী! বড্ড বিব্রতকর এক অবস্থা।

'ছি! ছি!' তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম। 'করছ কী? থামো বলছি।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!' বিড়বিড় করল এভারি। 'ঈশ্বর তোমার সত্যিকার মঙ্গল করুন!! থামতে বলছ? যদি জানতে এতগুলো বছর কী নরকযন্ত্রণা সয়েছি আমি, তারপর তুমি এলে... জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করলে আমাকে! কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে কীভাবে থাকি, বলো? তুমি সবসময়েই আমার সত্যিকার বন্ধু

ছিলে... আজ আবারও প্রমাণ হয়ে গেল তা।'

'ধ্যাত্! খামোকা বড় করে দেখছ আমাকে,' বললাম হালকা গলায়। 'আমি আসলে একজন সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী। বন্ধুত্ব না, এসেছি আসলে ওই আইভরির জন্য।' হাত তুলে হাতির দাঁতের বেড়াটা দেখালাম ওকে। 'এমন কোনও হাতি শিকারীর নাম বলতে পারবে, যে ওগুলোর জন্য নিজের আত্মা পর্যন্ত বাজি ধরবে না?'

আমার ব্যাখ্যায় কান দিল না এভারি, বরং ওর মুখ দিয়ে আশীর্বাদের তুবড়ি ছুটল। সঙ্গে ফ্লাস্কে ভরা ব্র্যাণ্ডি ছিল, তাড়াতাড়ি সেটা বের করে খেতে দিলাম ওকে, যদি থামাতে পারি এই আশীর্বাদের যন্ত্রণা! শরীরও খানিকটা গরম হবে ওর এতে। কাজ হলো, ব্র্যাণ্ডি পেটে পড়তেই সুস্থির হতে শুরু করল এভারি। উঠে গিয়ে ওয়াম্বের বাড়ির ভিতরে হানা দিলাম। একটা কম্বল খুঁজে নিয়ে ফিরে এলাম বন্ধুর কাছে। ওর গায়ে জড়িয়ে দিলাম ওটা। এবার কিছুটা ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে ওকে।

'এবার বলো দেখি,' জিজ্ঞেস করলাম, 'ওয়াম্বে তোমাকে সিংহের ফাঁদের ভিতর ফেলার চেষ্টা করছিল কেন?'

ব্র্যাণ্ডির ফ্লাস্ক নামিয়ে রাখল এভারি। 'যুদ্ধের ফলাফল ওর বিরুদ্ধে চলে যেতে শুরু করায় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ব্যাটার। মাইওয়া নেতৃত্ব দিচ্ছে শুনে সে কী খ্যাপা! হঠাৎ ওর এক বউ বলল, আমাকে নাকি গাছের পাতায় কী যেন লিখে মাইওয়ার হাতে দিতে দেখেছে। ব্যস্, আর যায় কোথায়? ও নিশ্চিত হয়ে গেল, মাটুকুদের উপর এই হামলার পিছনে আমার হাত আছে। শহরের দুর্বল অংশগুলোর খবর নিশ্চয়ই আমিই পাচার করেছি শত্রুদের হাতে। জেতার তো কোনও আশা নেই,

কিন্তু আমাকে শাস্তি দিয়ে মনের জ্বালা জুড়াতে চেয়েছিল।' ব্র্যাণ্ডিতে আরেকবার চুমুক দিল ও। 'ওফ্, এতদিন পর আবার ইংরেজি শুনতে পেয়ে কী যে ভাল লাগছে!'

'কতদিন থেকে এখানে বন্দি হয়ে আছ, তা জানো?' জানতে চাইলাম আমি।

'ছ'বছরের বেশি... সঠিক বলতে পারব না। অনেকদিন হলো হিসেব রাখা ছেড়ে দিয়েছি। মেজর অল্ডি আর ওঁর তিন বন্ধুর সঙ্গে এসেছিলাম আমি, চল্লিশজন কুলিসহ। শয়তান ওয়াম্বে আড়াল থেকে হামলা চালিয়েছিল আমাদের উপর, সবাইকে খুন করেছিল আমাদের বন্দুকগুলো হাতিয়ে নেবার জন্য। অবশ্য অস্ত্রগুলো খুব একটা কাজে লাগেনি ব্যাটার। ওগুলো ছিল ব্রিচ-লোডার, গর্দভেরা মাসদুয়েকের মধ্যেই সমস্ত অ্যামিউনিশন খরচ করে ফেলেছিল। এখনও আছে সব, ওয়াম্বের বাড়ির ভিতরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, নষ্ট হয়নি একটা বন্দুকও। আমি বেঁচে গেছি স্রেফ কপালজোরে। ওরা যখন আক্রমণ করল, তখন একটা রাইফেলের মেরামতি করছিলাম। তা দেখে ওদের মনে ধারণা জন্মাল, আমি নিশ্চয়ই অস্ত্রের কারিগর-টারিগর টাইপের কিছু একটা হব। তাই খুন না করে বন্দি করেছিল আমাকে। দু-দু'বার পালাবার চেষ্টা করেছি, ধরা পড়েছি প্রতিবারই। ভয়ানক শাস্তি পেতে হয়েছে তার জন্য। শেষবার তো চাবুকপেটা করে প্রায় মেরেই ফেলেছিল, পিঠে এখনও আছে সে-দাগ। গোপনে চিকিৎসা করে আমাকে আবার সুস্থ করে তুলেছিল মাইওয়া। সিংহের ফাঁদটাও ওয়াম্বে পেয়েছে আমাদের কাছ থেকে। আমার ধারণা, গত ছ'বছরে দেড়শ' থেকে দুইশ' মানুষকে হত্যা করা হয়েছে ওটায় ফেলে। ব্যাপারটা ছিল ওয়াম্বের সবচেয়ে প্রিয়

শখ—ফাঁদে একজন মানুষকে আটকে বসে বসে দেখবে তার মৃত্যু। কখনও কখনও খাবার আর পানিও দেয়া হতো হতভাগ্য মানুষগুলোকে, যাতে বেশিদিন বেঁচে থাকে ওরা... কষ্টটা প্রলম্বিত হয়। ওয়াম্বে লোভ দেখাত, নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারলে মুক্তি দেবে বন্দিকে, যদিও শেষ পর্যন্ত দিত না। সবাই ওই ফাঁদের ভিতর মারা গেছে, পাহাড়ের পিছনে স্তূপ হয়ে থাকা কঙ্কালগুলো দেখাতে পারব আমি।'

'পিশাচ কোথাকার!' দাঁতে দাঁত পিষলাম। 'মনে হচ্ছে ভুলই করেছি নাক গলিয়ে। ওকে ওখানেই তিলে তিলে মরতে দেয়া উচিত ছিল।'

'সামান্য হলেও তো স্বাদ পেয়েছে,' বলল এভারি। 'তা-ই বা মন্দ কী? কিছুটা তো ন্যায়বিচার হয়েছে। এবার বাকি বিচার হবে নরকে... ওখানেই ঠাঁই পাবে বদমাশটা, আমি নিশ্চিত।'

কথা বলতে থাকল ও, আর আমি তা চুপচাপ শুনতে থাকলাম। মনে বিস্ময়, এতগুলো বছর ধরে কীভাবে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রেখেছে মানুষটা! যেভাবে শোনাচ্ছি, ঠিক সেভাবে অবশ্য কথা বলছিল না ও... মানে শুদ্ধ ইংরেজিতে আর কী। খুব আস্তে, থেমে থেমে প্রতিটা বাক্য উচ্চারণ করছিল, যেন কিছু আটকে আছে গলায়। ঘন ঘন ব্যবহার করছিল স্থানীয় শব্দ, দীর্ঘদিনের চর্চার অভাবে ইংরেজির বহু শব্দই ভুলে গেছে বেচারা।

অনেকক্ষণ পর আমাদের সামনে এসে হাজির হলো নালা, জানাল, খাবার তৈরি। ক্ষুধায় পেট জ্বলছিল, তাড়াতাড়ি পেটপুজো সেরে নিলাম। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে একসঙ্গে আলোচনায় বসলাম আমরা। হাজারখানেক যাটুকু সৈন্য মারা গেছে লড়াইয়ে, তারপরেও অন্তত দু'হাজার টিকে আছে... লুকিয়ে পড়েছে পাহাড়ি

গুহা আর আশপাশের জঙ্গলে। এ-সব সৈন্য, সেইসঙ্গে দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মাটুকুরা এখনও বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। প্রশ্ন উঠল, কী করা হবে এদের ব্যাপারে? খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হবে, নাকি যেমন আছে তেমনই থাকতে দেয়া হবে?

সবার মতামত শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। নানা রকম ইচ্ছে একেকজনের। শেষে আমার বক্তব্য শুনতে চাইল নালা। ওকে বললাম, মহান জুলু রাজা চাকার আদর্শ অনুসরণ করা উচিত ওর। মাটুকু জাতিকে ধ্বংস নয়, বরং নিজেদের মাঝে ভিড়িয়ে নেয়া উচিত। যুদ্ধশেষে যাদেরকে বন্দি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেক নারী আছে। তাদের মাঝ থেকে কিছু বার্তাবাহিকা নির্বাচন করা হোক, লুকিয়ে থাকা মাটুকুদের কাছে যাবে ওরা, নালার প্রস্তাব পেশ করবে। বুটিয়ানা সর্দারের সামনে এসে অস্ত্র সমর্পণ করলে ক্ষমা পাবে সবাই, ওদের গোত্রে শামিল হতে পারবে, ফিরে পাবে গবাদি পশুসহ সমস্ত সম্পত্তি। শুধুমাত্র ওয়াম্বের ধনসম্পদ দখল করবে নালা, আর কারও নয়। তা ছাড়া কোনও সন্তান রেখে যায়নি মাটুকু সর্দার, তাই তার স্ত্রী মাইওয়াকে নেত্রী হিসেবে মেনে নিতে হবে ওদেরকে। এসব শর্ত মেনে নিলে নালার অধীনে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে ওরা। এই প্রস্তাব যদি দু'দিনের মধ্যে মেনে না নেয়, ধরে নেয়া হবে, যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক মাটুকুরা। তখন ওদেরকে শিকার করতে বের হবে বুটিয়ানারা, ধ্বংস করে দেয়া হবে ওদের সমস্ত গ্রাম, কবজা করে নেয়া হবে সমস্ত সহায়-সম্পত্তি।

আমার এই মতামতের সঙ্গে সমস্বরে সম্মতি জানাল সবাই। সে-অনুসারে তখুনি পাঠিয়ে দেয়া হলো বার্তাবাহিকা নারীদেরকে। ওদের চেহারা দেখেই বুঝলাম, এমন প্রস্তাব পাবে বলে আশা

করেনি। বুঝতে পারছে, যে-দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছে, তা সফলভাবে পূরণ করতে পারবে। নিয়ে আসতে পারবে ইতিবাচক জবাব। তারপরেও পুরো বিকেল যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য ব্যয় করলাম আমরা। মাটুকুরা আচমকা হামলা করে বসলে যেন যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেয়া যায়। আহতদের সবাইকে একত্র করে চিকিৎসারও আয়োজন করলাম আমরা।

সে-সন্ধ্যায় দীর্ঘ সাত বছর পর পাইপ ধরাল এভারি। বেচারা... আবেগের আতিশয্যে প্রায় কেঁদে ফেলল ও। রাতে কোনও ধরনের হামলার শিকার হলাম না আমরা। বরং পরদিন সকাল থেকে দেখতে পেলাম বুটিয়ানাদের পাঠানো প্রস্তাবের ফলাফল। ছোট ছোট দলে উদয় হতে শুরু করল মাটুকু জাতির নারী, শিশু আর পুরুষরা। শহরে ঢুকে যার যার বাড়িতে আশ্রয় নিল ওরা। বুটিয়ানা যোদ্ধাদেরকে লুটপাট এবং প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত রাখতে বেশ বেগ পেতে হলো। যুদ্ধজয়ের পর এ-ধরনের অনাচার শুধু কালোরা নয়, শ্বেতাঙ্গ মানুষও করে থাকে। শেষ পর্যন্ত চরম অবস্থান নিল নালা। এক বুটিয়ানা সৈন্য হাতেনাতে ধরা পড়ল মাটুকু এক তরুণীর সঙ্গে জবরদস্তি করতে গিয়ে। তাকে সবার সামনে এনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। ব্যস, বাকিরা এরপর থেকে আর কোনও ঝামেলা পাকানোর সাহস পেল না।

দ্বিতীয় দিন সকালে হাজির হতে শুরু করল মাটুকুদের গণ্যমান্য ব্যক্তি আর বেঁচে যাওয়া যোদ্ধারা। দুপুর নাগাদ ওরা সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করল সর্দার নালার সামনে। স্বীকার করল, পরাজিত হয়েছে মাটুকুরা, সর্দার ওয়াম্বেও নিহত। তাই সম্মান দেখাতে চায় বুটিয়ানাদের সিংহপুরুষ সর্দারকে।

সেইসঙ্গে শেয়ালের মত ধূর্ত সাদা শিকারীকে, যার বুদ্ধির সামনে হার মানতে হয়েছে ওদেরকে; আর মাইওয়া নামের সেই যুদ্ধদেবীকে, অস্ত্র হাতে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন মাটুকু-বধের।

শান্তভাবে ওদের কথা শুনল নালা। তারপর একটা ভাষণ দিল মাটুকুদের উদ্দেশে। জানিয়ে দিল তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপারে, বিশেষ করে পরাজিত মাটুকুদের নেত্রী হিসেবে মাইওয়ার নিযুক্তির কথাটা। সব শর্ত মেনে নিল মাটুকুরা। জানাল, একজন নারীর নেতৃত্ব মেনে নিতে আপত্তি নেই ওদের। আর যা-ই হোক, ওয়াম্বের চেয়ে খারাপ হতে পারে না মাইওয়ার শাসন। তা ছাড়া ওকে ভাল করেই চেনে ওরা, ভয়ের কিছু দেখছে না।

মেয়ের দিকে ফিরল এবার নালা। জানতে চাইল, মাটুকুদের নেত্রী হতে ওর আপত্তি আছে কি না।

প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্য পূরণ হয়ে যাবার থেকে বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে মাইওয়া। পিতার প্রশ্ন শোনার পর প্রথমবারের মত ওর মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম। দৃঢ় স্বরে সম্মতিজ্ঞাপন করল ও, সেই সঙ্গে জানিয়ে দিল, ন্যায়নীতি আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে মাটুকুদের মাঝে। যারা ওর অনুগত থাকবে, তারা পাবে সম্মান আর স্নেহ; কিন্তু যারা বিরোধিতা করবে, তাদেরকে দমন করা হবে কঠোর হাতে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না মেয়েটা।

যা হোক, মাটুকুদের প্রতিনিধি মেনে নিল ওর কথা আর নেতৃত্ব। তাই সেদিনকার মত শেষ হলো সভা।

পরদিনটা আমি বিদায়ের প্রস্তুতি নেবার জন্য ব্যয় করলাম। মাটি খুঁড়ে তুলে আনলাম ওয়াম্বের সীমানার সমস্ত আইভরি। শারীরিক ধকল গেলেও বড় আনন্দ পেলাম কাজটা করতে গিয়ে।

প্রায় পাঁচশো আইভরি ছিল ওখানে। এভারির সঙ্গে কথা বললাম ব্যাপারটা নিয়ে। ও জানাল, বহুদিন থেকেই বেড়া হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে দাঁতগুলো। কে-কবে প্রথম সংগ্রহ করেছিল, তা জানা নেই কারও। স্থানীয়দের মাঝে নানা ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত আছে আইভরিগুলো নিয়ে।

সময় নিয়ে প্রতিটা দাঁত পরীক্ষা করলাম আমি আর এভারি। বুঝতে পারলাম, বহু প্রাচীন ওগুলো, তবে মানের দিক থেকে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। নরম, কিংবা কাঁচা দাঁত নেই একটাও। এতদিন কেটে যাবার পরও ওগুলো নিখুঁত অবস্থায় আছে। এবার ওগুলো নিয়ে যাবার পালা। একটু খুঁতখুঁতানি অনুভব করলাম, নালা আবার বেঁকে বসে কি না। আমার দায়িত্ব তো শেষ, এখন লোকটা কথা না রাখলে কী-ই বা আর করতে পারব আমি? ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়লাম সর্দারের কাছে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল নালা। বলল, 'নিয়ে যাও, মাকুমাজান। নিয়ে যাও। ওগুলো তুমি অর্জন করেছ।'

কয়েকশ' মাটুকু কুলিও দিল সে আমাদের সঙ্গে। তাদের পিঠে আইভরিগুলো চাপিয়ে পরদিনই ফিরতি পথ ধরলাম আমি আর জন এভারি।

রওনা হবার আগে বিদায় নেবার জন্য মাইওয়ার কাছে গেলাম। ও তখন শ'তিনেক যোদ্ধার ব্যক্তিগত বাহিনী নিয়ে শহরের মেরামত শুরু করেছে। আমি সামনে হাজির হতেই রানির মত ডান হাত বাড়িয়ে দিল চুমো খাবার জন্য। তা-ই করলাম আমি। জানলাম, চলে যাচ্ছি আজই।

'মাকুমাজান,' বলল ও, 'সাহসী মানুষ তুমি, প্রকৃত বন্ধু। প্রয়োজনের সময় সবকিছু তুচ্ছ করে সাহায্য করেছ আমাকে, এই

দয়ার কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। যখনই কোনও কিছুর প্রয়োজন হয়, নিদ্বির্ধায় চলে এসো আমার কাছে। ঋণ পরিশোধের সুযোগ পেলে খুব খুশি হব।'

'আসব,' কথা দিলাম আমি। তারপর সরে এলাম ওর সামনে থেকে। অদ্ভুত ওই মেয়েটার সঙ্গে সে-ই আমার শেষ দেখা। কয়েক বছর আগে অবশ্য খবর পেয়েছিলাম, মারা গেছে নালা; মাইওয়া এখন দুই গোত্রেরই নেত্রী। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাকি চালাচ্ছে শাসন।

যা হোক, ওয়াম্বের শহর থেকে ফেরার সময় অন্যরকম একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন। ক'দিন আগে ওখানে ঢোকার সময় যা অনুভব করেছিলাম, এ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। যা ঘটে গেছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট আমি, কিন্তু এভারিরর প্রতিক্রিয়া হলো কয়েক কাঠি বাড়া। মাটুকুদের সীমানা থেকে বেরিয়ে আসামাত্র মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, উচ্চকণ্ঠে ধন্যবাদ জানাতে শুরু করল স্রষ্টাকে—ওকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেছেন বলে। কৃতজ্ঞতার অশ্রু বয়ে গেল ওর গাল বেয়ে। এই দৃশ্য দেখে আমাদের সঙ্গের কুলিরা মুখ টিপে হাসতে থাকল। তবে এভারিরর মনের দশাটা খেয়াল রাখতে হবে। দাড়ি-টাড়ি কেটে কিছুটা সভ্য হয়েছে ও, ছেঁড়াফাটা পোশাক গায়ে দিয়েছে, কিন্তু তাতে মানসিক পরিবর্তন তো আর ঘটে না। সাতটা বছরের অমানবিক জীবনযাপনের পর মুক্তি পেয়েছে বেচারা, ও যদি স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা না জানায়, তা হলে জানাবে কে?

আমাদের সঙ্গে মাটুকু রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত এল নালা। ওখানেই বিদায় জানাল। তারপর রওনা হলো নিজের এলাকার দিকে। যাবার আগে শ'দেড়েক সৈন্য দিয়ে গেল আমাদের

নিরাপত্তার জন্য। এরা ছ'দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে, খেয়াল রাখবে মাটুকু কুলিদের উপর—যাতে ওরা গোলমাল পাকাতে না পারে। তারপর ফিরে আসবে। ব্যবস্থাটাতে বেশ খুশি হলাম। ছ'দিনে পরিচিত জগতে পৌঁছাতে পারব বলে আশা করছি। ওখান থেকে ডেলাগোয়া বে পর্যন্ত আইভরি নেবার বহু উপায় পাওয়া যাবে।

যে-নদীটা ধরে কিছুদিন আগে এই এলাকায় এসেছিলাম, সেটা ধরেই আবার ফিরে চললাম আমরা।

নয়

উপসংহার

কাহিনির শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছেন মি. কোয়াটারমেইন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত? সব আইভরি নিতে পেরেছিলেন ডেলাগোয়া বে-তে?'

'না,' বিষণ্নভাবে মাথা নাড়লেন কোয়াটারমেইন। 'নদী পেরুতে গিয়ে তিনভাগের একভাগ হারিয়েছিলাম। আমরা যখন পানিতে নেমেছি, আচমকা বন্যার স্রোত শুরু হয়ে গেল... কোনোরকম জানান দেয়া ছাড়া। ডুবে মরার দশা হয়েছিল, কুলিদের অনেকেই আইভরি ফেলে দিয়ে সাঁতার কেটে উঠে

এসেছিল পাড়ে। ওগুলো পরে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ফেলেই চলে আসতে হয়েছিল। তারপরেও খুব একটা ক্ষতি হয়নি। যা বাঁচাতে পেরেছিলাম, তা সাত হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করে দিয়েছিলাম ডেলাগোয়া বে-র বাজারে। সে-আমলে সাত হাজার পাউণ্ড তো অনেক টাকা! অর্ধেক দিয়েছিলাম এভারিকে। বেচারা সাতটা বছর যা সয়েছে, তারপরে ওই আইভরির উপরে ওর অধিকার এসে যায়। ভাগের টাকা দিয়ে পুরনো কলোনিতে একটা দোকান খোলে ও, সেই ব্যবসা থেকে বিরাট ধনী হয়ে যায়।’

‘সিংহের ফাঁদটার কী হলো?’ জানতে চাইলেন সার হেনরি।

‘ওহ্, ওটা আমার সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলাম,’ বললেন কোয়াটারমেইন। ‘ডারবানে পৌঁছুনোর পর সাজিয়ে রেখেছিলাম আমার বাড়িতে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, জিনিসটাকে একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না আমি। ওটার সামনে গেলেই মনে পড়ে যেতে মাইওয়ার বাচ্চাসহ অগণিত নিরীহ মানুষের কথা, যারা ফাঁদের ভিতরে জীবন দিয়েছে। অসুস্থ বোধ করতাম। এক পর্যায়ে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম, ওটা যেন আমার পা কামড়ে ধরেছে। এ-যন্ত্রণা আর কাঁহাতক সহ্য হয়? তাই শেষ পর্যন্ত বাক্সে ভরে ওটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ইংল্যাণ্ডে—ফাঁদটার প্রস্তুতকারকের কাছে। একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম, ওদের এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রটা কী কাজে ব্যবহার হয়েছে। যদ্দূর শুনেছি, ওরা পরে জিনিসটা একটা জাদুঘরে দান করে দিয়েছিল।’

‘আর সেই তিন দৈত্যাকার হাতির দাঁতগুলো? ওগুলো তো নিশ্চয়ই যুদ্ধের সময় ওয়াম্বের শহরে নিয়ে যাননি? নালার গ্রামে রেখে গিয়েছিলেন। ফেরত পেয়েছিলেন পরে?’

তিক্ততা ফুটল কোয়াটারমেইনের চেহারায়। 'এই তো আরেক দুঃখের স্মৃতি মনে করিয়ে দিলেন! দাঁতগুলোর জন্য এখনও আমার বুক টনটন করে...'

'কেন... কী হয়েছিল?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন গুড। 'নালা দখল করে নিয়েছিল নাকি?'

'না, ও অত ছোটলোক না,' বললেন কোয়াটারমেইন। 'আমাকে কথা দিয়েছিল, পরে লোক মারফত পাঠিয়ে দেবে দাঁতগুলো ডেলাগোয়া বে-তে। পাঠিয়েওছিল। কিন্তু যারা ওগুলো নিয়ে আসছিল, তারা ছিল নিরস্ত্র। পথে আধা-পর্তুগিজ এক দস্যুর কবলে পড়ে যায় লোকগুলো, দাঁতগুলো কেড়ে নেয় ওই দস্যু। বহুদিন পরে আমি অবশ্য ব্যাটাকে বাগে পেয়েছিলাম, প্রতিশোধও নিয়েছি। কিন্তু তাতে স্রেফ মনের রাগ মিটেছে, দাঁতগুলো আর পাইনি। আমার ধারণা, ওই তিনটে আইভরি এখন চুলের কাঁটা আর চিরুণী হয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

'হুম,' বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন গুড। 'ভালই গল্প শোনালেন বটে, কোয়াটারমেইন। তবে...'

'তবে কী?' ভুরু কোঁচকালেন বৃদ্ধ শিকারী।

'তবে আপনার গল্পটা আমার ওই পাহাড়ি ছাগলের গল্পের চেয়ে ভাল হয়েছে বলে মনে হয় না। সমাপ্তিটা কেমন যেন হয়ে গেছে... মন ভরল না।'

মুখ বাঁকালেন কোয়াটারমেইন এই কথা শুনে। তবে তর্কে গেলেন না। প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'ক'টা বাজে, সে-খবর আছে আপনাদের? রাত আড়াইটা! এখন আর বাড়ি ফিরে কাজ নেই আপনাদের। চলুন, গেস্ট রুম খুলে দিচ্ছি। ওখানেই শুয়ে পড়ুন।

আগামীকাল আবার শিকারে বেরুনোর কথা আমাদের, ভুলে যাননি নিশ্চয়ই? সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়তে চাই আমি।'

'ভুলিনি, সার,' হাসলেন গুড। 'কাল তো আপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামব বলে ঠিক করে রেখেছি।'

'যত চেষ্টাই করুন, মি. কোয়াটারমেইনের ওই তিন পাখি শিকারের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন না আপনি,' বললাম আমি।

'কিংবা তিন হাতির রেকর্ড,' যোগ করলেন সার হেনরি।

সে-রাতে ঘুমের মাঝে মাইওয়াকে দেখলাম আমি। যেন বিয়ে হয়েছে আমাদের; সংসার করছি সুন্দরী, কিন্তু একরোখা মেয়েটার ভয়ে অস্থির হয়ে।

The Online Library of Bangla Books

মাগেপা দ্য বাক

এক

পুরনো বন্ধু

প্রয়াত মি. অ্যালান কোয়াটারমেইন, যাঁকে আফ্রিকায় মাকুমাজান বলে ডাকা হয়, তাঁর জীবন-কাহিনি নিয়ে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে ইতোমধ্যে। তার মধ্যে *মেরি* নামের বইটির ভূমিকাতে মি. কার্টিস, মানে সার হেনরি কার্টিসের ভাই পাঠকদেরকে জানিয়েছেন, কোয়াটারমেইনের ইয়র্কশায়ারের বাড়িতে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছেন তিনি। এর মধ্যে *মেরি* হলো একটা, সঙ্গে আরও কিছু ছোট-বড় পাণ্ডুলিপি এসে পৌঁছেছে এই সম্পাদকের হাতে। দায়িত্ব পেয়েছি এসব কাহিনি সাজিয়ে-গুছিয়ে একে একে প্রকাশ করার। কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি বেশ কিছু অসংলগ্ন চিরকুটও হাতে এসেছে আমার—বেশিরভাগই শিকার কিংবা বুনো প্রাণী সংক্রান্ত, কিছু আছে ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্ধৃতি, স্মৃতিপঞ্জিও পেয়েছি কিছু; এ-ছাড়া রয়েছে এমন কিছু ঘটনার বিবরণ, যেগুলো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু কোথাও প্রকাশ করেননি অতীতে।

এমন একটা চিরকুটের কথা বলব আজ। পুরনো, জরাজীর্ণ এক বইয়ের ভিতরে পেয়েছি ওটা—বহু ব্যবহারে বইটার একেবারে

যায় যায় দশা। বইটা দেখার পর অনেকদিন আগের এক আলাপচারিতার ঘটনা মনে পড়ে গেল। মি. কোয়াটারমেইনের ইয়র্কশায়ারের বাড়িতে আমি তখন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, এক রাতে গল্প করছিলাম আমরা সবাই মিলে। যে-চিরকুটের কথা বলছি, তা অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত, দেখে মনে হয় তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে। সম্ভবত কোনও একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার ঠিক পর পরই। শুরুটা এ-রকম:

'জানি না, পরলোকে অসমসাহস আর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের জন্য কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে কি না। থাকলে ভাল হতো। অন্তত আমি সে-পুরস্কার মাগেপা নামে বুড়ো মানুষটিকে দেবার জন্য ওকালতি করতাম। ওর কারণে মনুষ্যত্ব নিয়ে গর্ববোধ করতে শিখেছি আমি। অথচ সামান্য এক কালো অসভ্য ছাড়া আর কিছু নয় সে, লোকে ওদেরকে কাফ্রি বলে গাল দেয়...'

এটুকু পড়ে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তায় ডুবে গেলাম। কী বোঝাতে চাইছেন কোয়াটারমেইন? মাগেপা নামটাও কেন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। কোথায় শুনেছি আগে? ভাবতে শুরু করলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব। স্মৃতির মাঝে ফিরে গেলাম অতীতে। বহুদিন আগে, আমি তখন নিতান্ত যুবক, আবিষ্কার করলাম নিজেকে মি. কোয়াটারমেইনের বাড়ির বসার ঘরে। এক রাতে ডিনারের পর ওখানে বসে ছিলাম আমি। সঙ্গে সার হেনরি কার্টিস আর ক্যাপ্টেন গুড। ধূমপান করতে করতে আলাপ করছিলাম এটা-সেটা নিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে উঠে এল সাহসিকতার কথা। পালা করে সবাই বলতে শুরু করলাম নিজেদের দেখা সেরা সাহসিকতার কাহিনি। আমাদের তিনজনের বলা শেষ হলে মুখ খুললেন কোয়াটারমেইন।

'আপনাদের আপত্তি না থাকলে এবার আমি একটা গল্প

শোনাব,' বললেন তিনি। 'আমার দেখা সেরা সাহসিকতা বলা চলে এটাকে। ঘটনাটা জুলু যুদ্ধের সূচনালগ্নে ঘটেছিল। সশস্ত্র সৈন্যরা যখন জুলুল্যাণ্ডে ঢুকতে শুরু করেছে, আমি তখন সামান্য এক ট্রান্সপোর্ট-রাইডার—নামমাত্র বেতনে সরকারি চাকরি করছি... সেবা করছি সামরিক কর্তৃপক্ষের। তিনটে ওয়্যাগন ভাড়া করে দিয়েছিলাম সেনাবাহিনীকে, সঙ্গে প্রয়োজনীয় কুলি আর ওয়্যাগন-চালক। ষোলোটা তাগড়া ষাঁড় দিয়েছিলাম গাড়িগুলো টানার জন্য। এর বিনিময়ে কিছু টাকা পেলাম... কত পেলাম বলতে চাই না, বড়ই লজ্জাজনক এক অঙ্ক। আসলে সে-আমলে রাজকীয় অফিসাররা বড়ই ধুরন্ধর ছিল, সরকারি তহবিল তসরুপে জুড়ি ছিল না ওদের। টাকা দেবার বেলায় চরম কৃপণতা দেখাত, অথচ সরকারি খাতায় লিখত আসল খরচের চারগুণ। যুদ্ধের ওই সময়টাতে কত অফিসার যে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে, তার কোনও হিসেব-নিকেশ নেই। যা হোক, ওসব নিয়ে এ-মুহূর্তে কথা না বাড়ানোই ভাল।

'আমার কথা বলছিলাম... ওয়্যাগন বাবদ মোটাসোটা একটা ভাড়া দাবি করেছিলাম, সেটা না পেলেও সে-সময়ের তুলনায় মোটামুটি ভাল টাকা দেয়া হলো আমাকে। ভাড়া নিতে এসেছিল তরুণ এক লেফটেন্যান্ট, আফ্রিকায় এসেছে তিন সপ্তাহও হয়নি, একেবারে অনভিজ্ঞ; সম্ভবত এ-কারণেই সহকর্মীদের চেয়ে বেশি টাকা দিল আমাকে। মনটা বেশ খুশি হয়ে গেল, বাহিনীর নেতৃস্থানীয় অফিসারদেরকে বিনে পয়সায় কিছু উপদেশ দিতে গেলাম। বড্ড তাড়াহুড়ো করে আগে বাড়ছে ওরা; সতর্ক করে দিলাম, রয়ে-সয়ে না এগোলে বিপদে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু সামান্য এক ট্রান্সপোর্ট রাইডারের কথা কে শোনে? তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য

করে আমাকে তাড়িয়ে দিল ওরা। যদি গুরুত্ব দিত, তা হলে হয়তো *ইসালদোয়ানা*-র বিপর্যয়ের শিকার হতো না।'

ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেলেন কোয়াটারমেইন। ওই ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা জানা আছে আমার। দুঃখজনক সে-অভিজ্ঞতার ব্যাপারে কখনও আলোচনা করেন না তিনি। ভয়ঙ্কর লড়াই হয়েছিল ইসালদোয়ানায়, কোয়াটারমেইন কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরলেও হারিয়েছিলেন বহু বন্ধুকে।

একটু পর নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। খেই ধরলেন গল্পের। 'বুড়ো মাগেপার কথা বলব এবার। অনেকদিন থেকে ওর সঙ্গে পরিচয় আমার। প্রথম দু'জনের দেখা হয়েছিল *টুগেলা*-র যুদ্ধে। টুলওয়ানা রেজিমেন্টের অংশ হিসেবে আমি তখন রাজপুত্র উমবেলাজির হয়ে লড়াই করছি। সে-গল্প লিখে রাখার ইচ্ছে আছে, এমন সব ঘটনা ঘটেছিল, তা হারিয়ে যেতে দেয়া যায় না। আপনাদেরকে ওসবের কিছুটা শুনিয়েছি আমি আগে। যুদ্ধে পুরো টুলওয়ানা বাহিনী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল! *কেটেওয়ায়ো*-র তিনটা রেজিমেন্টকে খতম করেছিলাম আমরা, কিন্তু তারপরে আমাদের তিন হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র জনাপঞ্চাশেক বেঁচেছিল। মাগেপা ছিল ওই বেঁচে যাওয়া সৈন্যদের মধ্যে।

'লড়াইয়ের ময়দানে পরিচয় হয়নি আমাদের, হয়েছিল পরে... বৃদ্ধ রাজা পাণ্ডার গাঁয়ে যাবার পর। বন্দি করে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওখানে। মাগেপাকে দেখে মনে পড়েছিল, ও আমার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে অনেকটা সময়। দু'জনে কথা বলতে শুরু করলাম, একটু পরে রাজপুত্র কেটেওয়ায়ো হাজির হলো আমাদের সামনে। আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করল সে; জানত, কী পরিস্থিতিতে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সে-কাহিনি পরে কোনোদিন শোনাব আপনাদেরকে।

'যা হোক, মাগেপাকে দেখে ক্রোধ ফুটল রাজপুত্রের চোখের তারায়। বলল, "মাকুমাজান, এ কি সেই কুকুরদের একজন নয়, যারা আমাকে কামড়াবার চেষ্টা করছিল? ব্যাটা ধূর্তও বটে, নিশ্চয়ই খুব জোরে দৌড়াতে পারে। নইলে বাকিদের মত মরে পড়ে থাকত ময়দানের ধুলোয়। ইশ্... ইচ্ছে করছে একটা দড়ি এনে কুকুরটার গলায় পরিয়ে দিই।"

'"সেটা উচিত হবে না, রাজপুত্র," বললাম আমি। "আপনার বাবা কথা দিয়েছেন, বন্দিদের কোনোরকম নির্যাতন বা অসম্মান করা হবে না। তা ছাড়া লোকটা সাহসী... আমার চেয়েও সাহসী। টুলওয়ানা বাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছিলাম আমি, কিন্তু ও নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়েনি।"

'মুখ বাঁকাল কেটেওয়ায়ো। "নিজেকে অত ছোট করে দেখিয়ো না, মাকুমাজান," বলল সে। "তুমি পালাওনি, পালিয়েছিল তোমার ঘোড়া। যুদ্ধের ময়দানের মাঝখানে বিগড়ে গিয়েছিল ওটা। তোমাকে পিঠে নিয়েই ছুট লাগিয়েছিল প্রাণ বাঁচানোর জন্য। থাক সে-কথা, তুমি যখন এ-কুকুরটাকে পছন্দ করো, আমি ওর কোনও ক্ষতি করব না।" কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল রাজপুত্র।

'"ওর মুখের কথা বিশ্বাস করি না আমি," কেটেওয়ায়ো দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেলে বলে উঠল মাগেপা। "দেরিতে হলেও শাস্তি আমাকে দেবেই। কোনও কিছুই ভোলে না রাজপুত্র। এ-কথা ঠিক, মাকুমাজান, সত্যিই দৌড়েছিলাম আমি, পালিয়ে এসেছিলাম ময়দান থেকে; তবে তা সবার শেষে। তখন আর দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই করবার কোনও উপায় ছিল না। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, কেটেওয়ায়োর প্রথম রেজিমেন্টকে আমরা খতম

করে দেবার পর দ্বিতীয়টা কীভাবে হামলা চালিয়েছিল? ওটাকেও ঠেকিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু লড়াইয়ের মাঝে মাথায় একটা বল্লমের বাড়ি লাগে আমার। মাথায় একটা লোহার মুকুট পরে ছিলাম, সবচেয়ে কম বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলাম ওটা। ওই মুকুটের কারণেই মাথা ফেটে মারা যাইনি। কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। যখন হুঁশ ফিরল, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কেটেওয়ায়োর সৈন্যরা ময়দানের মাঝে আমাদের আহত যোদ্ধাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যাতে বন্দি করতে কিংবা হত্যা করতে পারে। আমাকে পেয়ে গেল ওরা।

'"লোকগুলো কাছে আসতেই চোখ বন্ধ করে মড়ার ভান ধরলাম। কাজেই আমাকে দেখার পর একটু সন্দেহ ভর করল ওদের মধ্যে। শরীরে বড় কোনও আঘাত নেই, অথচ পড়ে আছি লাশের মত। বল্লম বাগিয়ে এক সৈন্য এগিয়ে এল কাছে, খোঁচা মারবে।

'"আর ভান ধরে লাভ নেই, বল্লমের গুঁতো খেলে মারা যাব তখুনি। তাই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। চমকে গেল সৈন্যটা, তাড়াহুড়ো করে আঘাত করতে চাইল আমাকে, কিন্তু বডি কেটে তাকে ফাঁকি দিলাম আমি। ছুট লাগালাম প্রাণপণে। পিছন থেকে বাকিরা বল্লম ছুঁড়ল, এঁকে-বেঁকে সরে গেলাম ওগুলোর সামনে থেকে। হৈ হৈ করে এরপর আমাকে তাড়া করল ওরা। কিন্তু ধরতে পারেনি। জুলুল্যাণ্ডে আমার মত দৌড়াতে পারে না কেউ। আমাকে *বাক*... মানে হরিণ বলে ডাকে সবাই। সৈন্যদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি নামটার মর্মার্থ। ওদের নাকের ডগার সামনে থেকে পালিয়ে এসেছি। গাঁয়ে ফিরে এসেছি বলে আবার পড়েছি কেটেওয়ায়োর পাল্লায়, নইলে এতক্ষণে বহুদূর চলে যেতে পারতাম।"

‘“সাবাস, মাগেপা!” প্রশংসা করলাম ওর। “কিন্তু তোমাদের পুরনো প্রবাদটা ভুলে যেয়ো না। দক্ষ সাঁতারুকেও পড়তে হয় বিরূপ স্রোতের মুখে, ক্লান্তির কাছে হার মানতে হয় দক্ষ দৌড়বিদকেও।”

‘“জানি, মাকুমাজান,” মাথা ঝাঁকাল মাগেপা। “কে জানে, সামনের কোনও এক দিনে হয়তো হাতেনাতে দেখতে পাব কথাটার বাস্তবতা।”

‘ওর বক্তব্য নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি সেদিন, কিন্তু প্রায় ত্রিশ বছর পর মনে পড়ে গিয়েছিল সব। মাগেপার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা তো বললাম, এবার শোনাব জুলু যুদ্ধের সময় আমাদের বন্ধুত্ব আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাহিনি।

‘আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বাফেলো নদীর রোর্কেস ড্রিফট ধরে যে-বাহিনীটা ঢুকেছিল জুলুল্যাণ্ডে, তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমি। যুদ্ধ-ঘোষণা, এমনকী সামরিক অগ্রযাত্রার আগ থেকেই রোর্কেস ড্রিফটের স্টেশনে নানা রকম মালামাল আনা-নেয়া করতাম। জায়গাটা পরে বিভিন্ন কারণে অনেক খ্যাতি পেয়েছিল। যা হোক, একদিন শুনলাম, নদীর অন্যপাশে একটা গ্রাম আছে; অধিবাসীরা ইংরেজদের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন। ঠিক করলাম, দেখতে যাব জায়গাটা। অহেতুক ঝুঁকি নিচ্ছি বলে মনে হতে পারে আপনাদের, তবে এই ঝুঁকির পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন সর্দার বা রাজার অধীনে থাকে; তাদের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব গড়তে পারেন, নিরাপদে ঘুরে বেড়াতে পারবেন ওসব এলাকায়। আমার মত ট্রান্সপোর্ট রাইডারের জন্য এ-ধরনের নিরাপত্তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই সুযোগ পেলেই নিত্যনতুন গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম আমি, বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা

করতাম স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে।

'যে-ই ভাবা, সেই কাজ। এক সন্ধ্যায় নদী পেরিয়ে রওনা হয়ে গেলাম গ্রামটার উদ্দেশে। ঘোড়ায় চড়ে দশ মিনিট এগোতেই পৌঁছে গেলাম পাহাড়ি এলাকায়, দেখা পেলাম গন্তব্যের। গ্রামটা বেশি বড় নয়। বড়জোর আট-দশটা কুঁড়েঘর, আর একটা গবাদি পশুর খোঁয়াড়... পুরো জায়গা ঘিরে রাখা হয়েছে কাঠের বেড়া দিয়ে। চারপাশের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। গ্রামের চারপাশে সবুজ অরণ্য, পিছনদিকটা ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে, সৃষ্টি করেছে প্রাকৃতিক পাঁচিলের।

'আমাকে উদয় হতে দেখেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল গ্রামবাসীদের মধ্যে। নানা বয়সী নারী আর শিশুকে দেখলাম ছুটোছুটি করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়তে। গ্রামের ফটকে যখন পৌঁছুলাম, কেউ আমাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বাচ্চা এক ছেলের দেখা পেলাম। কাছে এসে গম্ভীর গলায় সে জানাল, গাঁয়ে কেউ নেই।

'"তা-ই?" বললাম আমি। "অসুবিধে নেই। গাঁয়ের সর্দারকে গিয়ে বলো, মাকুমাজান তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

'একটু ইতস্তত করল ছেলেটা। তারপর উল্টো ঘুরে চলে গেল ভিতরে। অনেকক্ষণ পর আরেকটা মুখের দেখা পেলাম, ফটকের ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কেমন যেন চেনা চেনা লাগল চেহারাটা, কিন্তু মনে পড়ল না আগে কোথায় দেখেছি। কিছুক্ষণ পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মানুষটা।

'লম্বা, শুকনো এক বৃদ্ধ। বয়স আন্দাজ করা কঠিন। ষাট হতে পারে, আবার হতে পারে নব্বুইও। বুড়ো হলেও আকর্ষণীয় চেহারা, মুখে ছোট করে ছাঁটা সাদা দাড়ি। চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়,

একহারা দেহ। হাতের আঙুলগুলো বেশ লম্বা, নার্ভাস ভঙ্গিতে সারাক্ষণ মটকাচ্ছে।

‘“স্বাগতম, মাকুমাজান!” বলে উঠল বৃদ্ধ। “মনে হচ্ছে আমাকে চিনতে পারছ না তুমি। টুগেলার যুদ্ধের কথা ভাবো... ভাবো টুলওয়ানাদের শেষ লড়াইয়ের কথা। রাজা পাণ্ডার গাঁয়ে কথা বলেছিলাম আমরা, রাজপুত্র কেটেওয়ায়ো এসে হুমকি দিয়েছিল—আমার গলায় দড়ি বাঁধবে।”

‘চিনে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। “আরে! মাগেপা না? হরিণ মাগেপা... ক্লান্তির কাছে এখনও তা হলে হার মানোনি তুমি?”

‘হাসল মাগেপা। “না, মাকুমাজান। এখনও না। তবে সময় সমাগত। বয়স তো কম হলো না।”

‘“তারপর? কেমন আছ?”

‘“মন্দ না। সবদিক থেকেই সুখী বলতে পারো, কেবল একটা ছাড়া। তিন বউ আমার, কিন্তু বাচ্চা-কাচ্চা নেই বললেই চলে। সবাই মারা গেছে রোগে-শোকে। আছে স্রেফ এক মেয়ে, আমার সঙ্গে থাকে। বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু কপাল খারাপ, ওর স্বামীও মারা গেছে কিছুদিন আগে। বুনো এক মোষ খুন করেছে বেচারাকে। মেয়েটা আর বিয়ে করেনি। ভিতরে এসো, নিজের চোখেই দেখো সব।”

‘ঢুকলাম গাঁয়ে। পরিচিত হলাম মাগেপার তিন বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে। বাবার ডাক পেয়ে মাগেপার মেয়েও এল—নাম গিতা; আমাকে পেয়ালায় ভরে দুধ খেতে দিল। বয়স খুব বেশি নয় মেয়েটার, বাপের চেহারা আর শারীরিক গড়ন পেয়েছে। চেহারায় দুখি একটা ভাব, সম্ভবত স্বামী হারানোর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বছরদুই বয়সের একটা বাচ্চা দেখলাম গিতার

সঙ্গে, মাগেপাকে দেখে ছুটে এল কাছে, উঠে পড়ল কোলে। জানলাম, এ মাগেপার নাতি—নাম সিনালা। তার গালে চুমো খেল মাগেপা।

'"দেবতাদের দয়ায় নাতিকে ভালবাসা দিতে পারছি এখনও, বলল বৃদ্ধ। "এই বাচ্চাই আমার বংশের শেষ প্রদীপ, মাকুমাজান। গাঁয়ে আর যত মানুষ আছে, তাদের কারও সঙ্গেই আমার রক্তের সম্পর্ক নেই, স্রেফ আমার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে ওরা।"

'শুরুতে যে-ছেলেটা ফটকের সামনে দেখা করেছিল আমার সঙ্গে, সে দাঁড়িয়ে আছে কাছেই। আরও কিছু বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে আশপাশে। অভিভাবক দেখছি না কারও।

'ওদের দিকে ইশারা করে জানতে চাইলাম, "বাচ্চাদের বাপ-রা কোথায়?"

'"দায়িত্বে ডাকে চলে যেতে হয়েছে ওদেরকে," সংক্ষেপে উত্তর দিল মাগেপা। বুঝলাম, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। তাই পাল্টে ফেললাম প্রসঙ্গ।

'পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করলাম আমরা কিছুটা সময় ধরে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, বিক্রি করার মত গরু বা ঘোড়া আছে কি না। এ-কাজেই এসেছি গাঁয়ে, বললাম মাগেপাকে।

'"না, মাকুমাজান," বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। "এ-বছর সমস্ত গরু-ছাগল রাজাকে দিতে হবে।"

'"ঠিক আছে," বললাম আমি। "অন্য কোথাও থেকে জোগাড় করে নেব নাহয়। আমাকে এবার উঠতে হয়, মাগেপা। অনেক কাজ পড়ে আছে।"

'"চলো, আমি তোমাকে নদী পর্যন্ত এগিয়ে দেব।"

'মাগেপার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম

গ্রাম থেকে। দু'জনে একসঙ্গে হাঁটছি। কিছুটা দূরে চলে আসার পর মনের কথা বলতে শুরু করল বৃদ্ধ।

‘“মাকুমাজান,” বলল সে, “যুদ্ধ বাধবে শীঘ্রি। কেটেওয়ায়ো কিছুতেই তোমাদের সাদা নেতার দাবি মেনে নেবে না।” সার বার্টল ফ্রেয়ারের কথা বলছে ও। “যুদ্ধ করবে সে... আর যুদ্ধটা শুরু করাবে তোমাদেরকে দিয়েই। কৌশলে তোমাদেরকে জুলুল্যাণ্ডে ঢোকাবে সে, তারপর সুবিধেজনক অবস্থানে নিয়ে গিয়ে হামলা চালাবে। ধ্বংস করে দেবে সবাইকে। ইংরেজদের আমি পছন্দ করি... তাই মানতে পারছি না ব্যাপারটা। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যুদ্ধ যদি বোয়ারদের সঙ্গে হতো, কিছু মনে করতাম না। বোয়ার জাতকে ঘৃণা করি আমরা জুলুরা, ইংরেজদের ঘৃণা করি না। এমনকী রাজা কেটেওয়ায়োও পছন্দ করে তোমাদেরকে। কিন্তু যদি যুদ্ধ করতে আসো, কাউকে একবিন্দু দয়া দেখাবে না সে।”

‘“ঠিক বলেছ,” সায় দিলাম ওর কথায়, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করলাম না। রাজা সম্ভবত তার গোত্র-সর্দারদের মাধ্যমে ভয় ছড়াবার চেষ্টা করছে ইংরেজদের মাঝে।

‘পাহাড়ি এলাকার মুখে এসে পড়েছি আমরা, কথা বলার সুবিধার্থে থামলাম ওখানে। সামনের খোলা প্রান্তরে দু'জনকে একসঙ্গে হাঁটতে দেখলে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে লোকের মনে। ভাবতে পারে, গোপন আঁতাত আছে আমাদের মাঝে।

‘যেখানটায় থেমেছি, জায়গাটা অতি সুন্দর। ঝোপঝাড় আর বুনো ফুলগাছে ভরা চারপাশ। সাদা একটা ফুল ফুটেছে কাছে, মিষ্টি সুবাস ছড়াচ্ছে। উঁচু উঁচু ঘাস জন্মেছে মাটিতে, তার মাঝ চিরে দাঁড়িয়ে আছে মিমোসা গাছের সারি।

'"মাগেপা," বললাম আমি। "যুদ্ধ যদি বেধেই যায়, পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে যাও না কেন তুমি? একটু চেষ্টা করলেই রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে নেটালে চলে যেতে পারবে।"

'"পারলে অবশ্যই যেতাম, মাকুমাজান," বলল মাগেপা। "ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দেখার ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু নেটালে তো নিরাপত্তা পাব না। একসময় না একসময় ঠিকই ওখানে যাবে রাজা, পুরো বাহিনী নিয়ে দখল করবে শহরটা। যারা তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছে, তাদেরকে হাতে পেলে কী করবে, তা ভাবতে পারো?"

'হাসলাম ওর অমূলক ভয় দেখে। বললাম, "এতই যদি দুশ্চিন্তা করো, তা হলে যেখানে আছ, সেখানে রয়ে গেলেই ভাল করবে।"

'"হেসো না, মাকুমাজান," বলল মাগেপা। "অনেককিছু চিন্তা করতে হয় আমাকে। গাঁয়ের সব সক্ষম পুরুষ গেছে রাজার বাহিনীতে যোগ দিতে। ওদের বউরা যদি পালিয়ে যায়, ওদের উপরেই প্রতিশোধ নেয়া হবে না? তা ছাড়া গরু-ছাগলগুলোর কী হবে? খালি হাতে নেটালে গিয়ে কী করব আমরা? আমার তো ধারণা, যাতে আমরা না পালাই, সেজন্যেই সমস্ত গরু-ছাগল চেয়ে পাঠিয়েছে রাজা।"

'"গরু-ছাগলের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি, মাগেপা। অন্তত তুমি তো পালাতে পারো!"

'"আমার লোকজনের কী হবে? ওদেরকে মৃত্যুর মুখে ফেলে যেতে বলছ? তুমি তো এ-ধরনের কথা বলতে না আগে, মাকুমাজান!"

‘“স্রেফ বাস্তবতার কথা বলছি আমি।” কাঁধ ঝাঁকালাম।

‘“হ্যাঁ, স্বীকার করছি সেটা। আচ্ছা, তুমি আমার একটা উপকার করবে? ভাল প্রতিদান দেব এর বিনিময়ে।”

‘“কী উপকার?”

‘“আমার মেয়ে আর নাতিকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে হবে। আমি বা আমার বউয়েরা মারা গেলে ক্ষতি নেই। বুড়ো হয়ে গেছি, ক'দিনই বা আর বাঁচব! কিন্তু ওদের সামনে পুরো জীবন পড়ে আছে। ওদের মাধ্যমেই বেঁচে থাকবে আমার নাম-পরিচয়। যদি রাজি থাকো, দু'দিন পরে... ভোরবেলায় ওদেরকে নদী পার করে পাঠিয়ে দিতে পারি আমি। কিন্তু কথা দিতে হবে তোমাকে—যেভাবে হোক, আমার মেয়ে আর নাতিকে নেটালে পৌঁছে দেবে তুমি। ওখানে ওদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে। কিছু টাকা লুকিয়ে রেখেছি আমি—পঞ্চাশটা স্বর্ণমুদ্রা। ওর অর্ধেক দিয়ে দেব তোমাকে। যদি সম্ভব হয়, আমার গবাদি পশুর অর্ধেকও নিতে পারবে তুমি।”

‘মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লাম। “টাকা-পয়সার কথা রাখো তো! মেয়ে আর নাতিকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছ, আমার জন্য এই-ই ঢের। যুদ্ধের সময় কী ঘটে না ঘটে, তার কোনও ঠিক নেই। এমন পরিস্থিতিতে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তার বাচ্চা-কাচ্চাকে অরক্ষিত রাখতে পারে না।”

‘“ঠিক বলেছ,” মাথা ঝাঁকাল মাগেপা। “বহু যুদ্ধ দেখেছি আমি, সেসব যুদ্ধে নিরীহ নারী বা শিশুর মৃত্যুও কম দেখিনি। যুদ্ধ কাউকে দয়া দেখায় না, মাকুমাজান।”

‘“যাক, কথাটা তা হলে জানা আছে তোমার। ঠিক আছে, মাগেপা, তোমার এ-কাজটা করে দেব আমি। কিন্তু তার বিনিময়ে

তোমাকেও একটা কাজ করতে হবে।”

‘“কী, মাকুমাজান?”

‘“আমাকে সত্যি কথা বলো, কেটেওয়ায়ো কি আসলেই যুদ্ধ করতে চায়, নাকি মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে? করলে কীভাবে করবে? এতক্ষণ যা বলেছ, সবই যে শিখিয়ে দেয়া বুলি ছিল, তা জানি আমি। এবার তোমাকে আসল খবর বলতে হবে।”

‘“গোমর জানতে চাইছ তুমি,” কণ্ঠে অস্বস্তি প্রকাশ পেল মাগেপার। ইতি-উতি চাইল চারদিকে। “কিন্তু এ-ও ঠিক—বর্শার বদলে বর্শা, আর ঢালের বদলে ঢাল... এ-ই আমাদের রীতি। ঠিক আছে, বলছি সব। মিথ্যে বলিনি এতক্ষণ—রাজা সত্যিই লড়াই করবে, তবে সেটা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, বরং জনগণের মাঝে নিজের অবস্থান পোক্ত করার জন্য। টুগেলার সেই যুদ্ধের পর থেকে বড় কোনও লড়াই হয়নি এ-দেশে, যোদ্ধাদের অ্যাসেগাইয়ের ফলায় মরচে পড়তে শুরু করেছে। পরিস্থিতি পাল্টানোর জন্য হবে এ-যুদ্ধ। লোকে তাতে সমর্থনও দিচ্ছে। কপাল খারাপ, টুগেলার রক্তপাত দেখেনি ওদের কেউই, ভাবতেই পারছে না কত রক্ত ঝরবে। তোমার-আমার মত প্রত্যক্ষদর্শী হাতে-গোনা; আমাদের কথায় কান দিচ্ছে না কেউ।”

“কেটেওয়ায়োর রণকৌশল সম্পর্কে কিছু বলতে পারো?”

‘পারল মাগেপা, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিল আমাকে। কিন্তু দুঃখের কথা, ওগুলো যখন পরে ইংরেজ বাহিনীর বড়কর্তাদের সামনে পেশ করলাম, হেসে উড়িয়ে দিল ওরা। নইলে জুলু যুদ্ধের ফলাফল অন্যদিকে মোড় নিতে পারত।

‘যা হোক, মাগেপার কথা শেষ হতেই সচকিত হয়ে উঠলাম। আমাদের পিছনে, ঘন ঝোপের ভিতরে খসখসানি শুনতে পেয়েছি।

মনে হলো যেন চাপা গলায় কেশেও উঠল কেউ। প্রমাদ গুনলাম। যদি আমাদের আলোচনা রাজার কোনও চরের কানে যায়, তা হলে দু'জনেই ভয়ানক বিপদে পড়ে যাব।

‘“কীসের শব্দ?” বিচলিত গলায় জানতে চাইলাম মাগেপার কাছে।

‘“নিশ্চয়ই বুনো হরিণ,” অনুমান করল বৃদ্ধ। “এদিকে ওদের আস্তানা।”

‘সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি একটুখানি ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিয়ে ঢুকে পড়লাম ঝোপঝাড়ের ভিতর। আবছা আলোয় কালো একটা অবয়বকে নড়ে উঠতে দেখলাম কয়েক গজ দূরে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে চলে গেল ওটা। মানুষ, নাকি অন্য কোনও প্রাণী, ঠিকমত ঠাহর করতে পারলাম না। চাঁদের আলোয় কী যেন একটা চকচক করে উঠতে দেখেছি—হরিণের শিং হতে পারে... আবার হতে পারে অ্যাসেগাইয়ের ফলাও।

‘আমার পিছু পিছু এসেছে মাগেপা। হালকা সুরে বলল, “বললাম না হরিণ? তবু... যদি ভয় করে তো চলো, জঙ্গলের ধার থেকে সরে যাই। অবশ্য সাদা মানুষদের ক্ষতি করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে রাজা। মানে এখন পর্যন্ত আর কী।”

‘নদীর দিকে ফের এগোতে শুরু করলাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করে নিলাম পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনা। কীভাবে-কখন মেয়ে আর নাতিকে পাঠাবে, কোথায় ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাব... সব স্থির করা হলো। মাগেপার কাছে জানতে চাইলাম, পরদিন ভোরেই ওদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছে না কেন। দু'দিন অপেক্ষা করার মানে কী? জবাবে ও জানাল, রাজার বাহিনীর একদল স্কাউট নাকি

সে-রাতের জন্য ঘাঁটি গেড়েছে ওর গ্রামে। পরদিন চলে যাবার কথা, কিন্তু দেরিও হতে পারে। ওদের উপস্থিতিতে গিতা আর সিনালাকে পাঠানো যাবে না। তাই একটু সময় নিচ্ছে। আশা করছে দু'দিনের মধ্যে চলে যাবে স্কাউটরা।

'নদীর ধারে পৌঁছে পরস্পরকে বিদায় জানালাম আমরা। ক্যাম্পে ফিরে দ্রুত একটা রিপোর্ট তৈরি করলাম যা যা জানতে পেরেছি, তার ওপর। রিপোর্টটা যথাসময়েই পাঠিয়েছিলাম বাহিনী-প্রধানের কাছে, কিন্তু বলেছি তো—গুরুত্ব দেয়া হয়নি ওতে।

'সমরনায়করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্যের পরামর্শ শুনতে চান না।'

দুই

ম্যাগেপার শেষ দৌড়

কাহিনি বলে চলেছেন কোয়ার্টারমেইন।

'পরদিন বেশ ভোরে ঘুম ভাঙল আমার। হাত-মুখ ধোয়ার জন্য চলে গেলাম নদীতে। গোসলও সেরে নিলাম একই সঙ্গে। বড় একটা চ্যাপ্টা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গা মুছতে মুছতে নজর বোলালাম পানির উপর। ভোরের হালকা কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে

নদীর উপর দিয়ে। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা—শান্ত, সমাহিত পরিবেশ। এখনও জেগে ওঠেনি কোনও প্রাণী। মন ভরে গেল আশ্চর্য এক প্রশান্তিতে।

'হায়! তখন যদি জানতাম, এই নীরবতার পর কী ভয়ানক আওয়াজ শুনব, তা হলে বোধহয় আনন্দটুকু অনুভব করতে পারতাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পূর্বাভাস পেতে শুরু করলাম।

'হঠাৎ আবছাভাবে ভেসে এল নারীকণ্ঠের চিৎকার। তার পিছু পিছু শোনা গেল হৈ-হল্লা আর নানা রকম আওয়াজ। অনেক দূর থেকে আসছে এসব শব্দ। কিছুক্ষণ পর আবার সব শুনশান হয়ে গেল।

'ফুরফুরে ভাবটা ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে আমার মধ্য থেকে। নিশ্চিত হবার উপায় নেই, কিন্তু কেন যেন মনে হলো, মাগেপার গ্রাম থেকে আসছে ওই আওয়াজ। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। হয়তো বুঝতে পারব কী ঘটছে।

'ধীরে ধীরে সূর্য উঠতে শুরু করেছে পুবাকাশে। আশপাশ আলোকিত হয়ে উঠতেই প্রথম যে-জিনিসটা আমার চোখে পড়ল, তা হলো ধোঁয়া। ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে উঠছে আকাশে... নদীর ওপারে, পাহাড়ি এলাকার মাঝ থেকে। ওখানেই মাগেপার গ্রাম। নিশ্চয়ই আগুন ধরেছে ওখানে।

'কিছু করার নেই আমার। মন খারাপ করে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। ঠিকমত মুখে দিতে পারলাম না নাশতা। পুরনো বন্ধুর অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কাঁপছে। গত সন্ধ্যার ঘটনা মনে পড়ে গেল। সত্যিই ওটা হরিণের শিং ছিল, নাকি অ্যাসেগাইয়ের ফলা? এমন কি হতে পারে না, কেটেওয়ায়োর কোনও গুপ্তচর লুকিয়ে

ছিল ওখানে? আড়ি পেতে শুনেছে আমাদের আলোচনা? ব্যাপারটা সত্যি হলে গাঁয়ের আগুন আর নারীকণ্ঠের চিৎকারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মাগেপার বিশ্বাসঘাতকতার কথা রাজার কানে গেলে নিঃসন্দেহে শাস্তির খড়্গ নেমে আসবে পুরো গ্রামের উপর। তেমনটাই ঘটেনি তো?

'সারাদিন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় কাটালাম। পরদিন ভোর হতেই আবার চলে গেলাম নদীর ধারে। দেখতে চাই, বাচ্চাকে নিয়ে গিতা আসে কি না। কিন্তু এল না ওরা, আসবার কথাও নয়। পরে জানতে পেরেছিলাম, তখন মেয়েটার প্রাণহীন দেহ পড়ে ছিল গ্রামের ধ্বংসস্তূপের ভিতর। কয়েকজন জুলু স্কাউটকে দেখলাম আমি নদীর অন্যপারে। আমার উপর চোখ পড়তেই হেসে উঠল ওরা। তাচ্ছিল্যের সুরে জানতে চাইল, কোথায় সেই সুন্দরী মেয়ে, যার অপেক্ষায় বসে আছি আমি?

'বুঝে ফেললাম, সব ফাঁস হয়ে গেছে। আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। তাই ফিরে এলাম ক্যাম্পে। ব্যস্ত হয়ে পড়লাম অন্য কাজে। জানতে পারলাম, সেনাবাহিনীকে অগ্রযাত্রার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; দলে দলে সৈনিক আর অফিসার জড়ো হতে শুরু করেছে নদীর ধারে।

'হঠাৎ নদীর ওপাশ থেকে আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল জুলুরা। বেশ নিশানা করে মারছিল ওরা, তাই বোধহয় একটা গুলিও লাগাতে পারল না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, আফ্রিকান অসভ্যরা নিশানা করতে চাইলে ব্যর্থ হয়, কিন্তু নিশানা ছাড়া এলোমেলো গুলি ছুঁড়লেই বিপদ। তখুনি সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে ওরা। এলোমেলো বুলেট কোথাও না কোথাও আঘাত করবেই।

'যা হোক, জুলুদের এই অতর্কিত হামলার জবাব দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। নদী পেরিয়ে অন্যপাশে পাঠানো হলো একদল স্থানীয় সৈন্যকে। লুকিয়ে থাকা জুলু বন্দুকধারীদের উপর পাল্টা আক্রমণ করল ওরা, খেদিয়ে ছাড়ল আমাদের ত্রিসীমানা থেকে। বিকেল পর্যন্ত পুরো এলাকা সরগরম হয়ে থাকল গোলাগুলির আওয়াজে।

'সন্ধ্যায় খবর পেলাম, বিজয় হয়েছে আমাদের। সৈন্যরা ফিরে আসছে সফল হয়ে। হাতে কোনও কাজ ছিল না, নদীর ধারে চলে গেলাম। উঁচু একটা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে চোখে ফিল্ড-গ্লাস লাগালাম, অন্যপারের যুদ্ধ-ময়দানের অবস্থা দেখার ইচ্ছে। মিছিল করে আমাদের সৈন্যদেরকে ফিরতে দেখলাম ওখান থেকে, যুদ্ধসঙ্গীত গাইছে গলা ছেড়ে। একটু পর কানে ভেসে এল নতুন আরেক আওয়াজ। ক্রুদ্ধ চিৎকার ছাড়ছে কারা যেন। ফিল্ড-গ্লাস ওদিকে ঘোরাতেই নজরে এল ছুটন্ত একজন মানুষ।

'তিনটা ব্যাপার লক্ষ করলাম আমি। লোকটা বেশ লম্বা, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ছুটছে, আর সবশেষে... ওর পিঠে কী যেন বাঁধা আছে। কেন এভাবে দৌড়াচ্ছে, তাও বুঝতে পারলাম। চারদিক থেকে ওকে ধাওয়া করে আসছে আমাদের সৈন্যরা। সবার চোখে-মুখে খুনের নেশা। লোকটাকে নাগালে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

'খুব শীঘ্রি টের পেলাম, নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য আছে ছুটন্ত মানুষটার। নদীর ধারে পৌঁছুতে চাইছে সে। খারাপই লাগল, নিঃসঙ্গ একজন মানুষকে এতজন সৈন্য মিলে ধাওয়া করছে দেখে। অবাকই হলাম, লোকটা পিঠের বোঝা ফেলে দিচ্ছে না কেন! হাত-পা ঝাড়া থাকলে তো আরও জোরে দৌড়াতে পারত।

এই বোঝার কারণে গতি অনেকটা কমে এসেছে তার, ধাওয়াকারীরা দ্রুত কমিয়ে আনছে দূরত্ব। না জানি কী মূল্যবান জিনিস আছে ওতে, কিন্তু ওর বোঝা উচিত—জীবনের চেয়ে দামি আর কিছু নেই।

'মানুষটা যখন দূরে ছিল, তখন এসব ভাবছিলাম আমি। কিন্তু আমার তিন-চারশ' গজের মধ্যে সে এসে গেলে চমকে উঠলাম। নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। গোধূলির আলোয় চিনতে পারলাম পুরনো বন্ধুর মুখ।

'"হা ঈশ্বর!" সশব্দে বলে উঠলাম। "এ তো মাগেপা! পিঠে নিশ্চয়ই ওর নাতিকে বয়ে নিয়ে আসছে!"

'সন্দেহের কোনও অবকাশ রইল না, বাচ্চাটাই বাঁধা আছে ওর পিঠে। এ-কারণেই বোঝাটা ফেলছে না সে।

'কী করব আমি? যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, সেখান দিয়ে নদী পেরুনো এককথায় অসম্ভব। ঘুরপথে যাবার চেষ্টা করতে পারি, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তিতে চেঁচাতে শুরু করলাম। বেকুব সৈন্যগুলোকে নির্দেশ দিলাম ওকে ধাওয়া না করতে। কিন্তু খুনের নেশা ভর করেছে ওদের মধ্যে। আমার চিৎকার শুনতেই পেল না।

'মাগেপা অবশ্য শুনল। গতি কমে গিয়েছিল ওর, আমাকে দেখতে পেয়েই যেন নতুন শক্তি ভর করল শরীরে। শেষবারের মত বিদ্যুৎবেগে ছুটল ও। নদী এখন ওর কাছ থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরে। প্রথম দুইশ' গজ পর্যন্ত ধাওয়াকারীদের চেয়ে এগিয়ে থাকল ও। কিন্তু এরপরেই বিদ্রোহ করে বসল বেচারার পেশি। বয়স তো কম হয়নি ওর, অন্যদিকে ধাওয়াকারীরা সবাই বয়সে তরুণ, গায়ে-গতরে সতেজ। ওর কাছে পৌঁছে যেতে শুরু করল

ওরা।

'ফিল্ড-গ্লাসে এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি মাগেপার মুখ। হাঁ হয়ে আছে, ঠোঁটের কোণ ঘেঁষে নামছে রক্ত মেশানো ফেনা। পিঠের বোঝা ওকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। একবার মনে হলো, ওটা খুলে ফেলার জন্য হাত তুলেছে; কিন্তু না, এক ঝটকা দিয়ে নাতিকে আরেকটু উপরে তুলে নিল, তারপর দৌড়াতে থাকল আগের মত।

'দু'জন সৈন্য সবচেয়ে এগিয়ে আছে, মাগেপার নাগালের মধ্যে চলে আসতে দেখলাম ওদেরকে। হাতে ওদের ছোট বর্শা, হাতাহাতি লড়াইয়ে ওগুলো ব্যবহার করা হয়। ছুঁড়ল না অস্ত্রদুটো, বরং কাছে গিয়ে বিঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা লক্ষ করলাম ওদের মাঝে। নদীতীর থেকে মাগেপা এখন মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, দুই সৈন্য রয়েছে দশ কদম পিছনে।

'ঘাড় ফিরিয়ে ওদেরকে এক পলক দেখল বৃদ্ধ, তারপর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে জ্যা-মুক্ত তীরের মত বাড়ল সামনে। খুশি হয়ে উঠেছিলাম ওর এই দৌড় দেখে, কিন্তু পানির কয়েক ফুট দূরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেচারা।

'"সব শেষ!" ভাবলাম হতাশ হয়ে। আফসোস হলো হাতে একটা রাইফেল নেই বলে। রক্তপিপাসু দুই খুনিকে ঠেকাতে পারতাম তা হলে।

'কিন্তু না, শেষ হয়নি সব। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মাগেপাকে লক্ষ্য করে বর্শা তুলল এক সৈনিক, পিঠে গেঁথে দেবে; এমন সময় একটা গড়ান দিল ও, পিঠের বদলে বুক পেতে দিল বর্শার সামনে। পিঠে বর্শা গাঁথলে ওর নাতি মারা যেত... সেটা হতে দিতে চায়নি।

'ঘ্যাচ্ করে মাগেপার বুকে গেঁথে গেল বর্শা। শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় হলো না, সম্ভবত হাড়ের গায়ে বাধা পেয়েছে ফলা। পুরো জিনিসটা তাতে কেঁপে উঠল, সৈনিকের হাত ছুটে গেল বর্শা থেকে। লাফ দিয়ে এবার উঠে দাঁড়াল মাগেপা। বর্শাটা বুক থেকে খুলে ছুঁড়ে মারল সৈনিকের দিকে। লোকটা আহত হয়ে পড়ে গেল।

'দ্বিতীয় সৈনিক এবার এগোতে শুরু করেছে ওর দিকে। পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল বৃদ্ধ। চকিতের জন্য মুখ ঘুরিয়ে চেঁচাল, "মাকুমাজান! সাহায্য করো আমাকে!"

'হতাশায় চিৎকার করে উঠলাম। কিচ্ছু করতে পারছি না। ব্যাপারটা টের পেয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাগেপা। পিছনে রক্তের ধারা রেখে সাঁতার কাটতে শুরু করল আমার দিকে। কিন্তু বুঝতে পারলাম, এ-পারে কোনোদিনই আর পৌছুতে পারবে না ও নিজের চেষ্টায়। ফিল্ড-গ্লাস ফেলে দিয়ে তাই আমিও ঝাঁপ দিলাম নদীতে। দুরন্ত স্রোতের মাঝখানে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে পৌছুলাম মাগেপার পাশে। ধরে ফেললাম ওকে। অনেক কষ্টে টেনে তুলে আনলাম পাড়ে।

'"আমার নাতি!" হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল মাগেপা। "আমার নাতি!! ও কি মারা গেছে?"

'তাড়াতাড়ি ওর পিঠ থেকে খুলে আনলাম বোঝাটা। কম্বল সরিয়ে বের করে আনলাম ছোট্ট সিনজাকে। নাকে-মুখে পানি ঢোকায় কাশছে বাচ্চাটা, কিন্তু আহত হয়নি একটুও। খানিক পর সশব্দে কেঁদে উঠল।

'"ও বেঁচে আছে, মাগেপা," বললাম নরম সুরে। "কিচ্ছু হয়নি ওর।"

'"তা হলে আমি শান্তিতে মরতে পারি, মাকুমাজান," দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাগেপা। প্রাণশক্তি ফুরিয়ে এসেছে ওর। একটু বিরক্তি নিয়ে বলল, "সেদিন রাতে ঝোপের ভিতরে হরিণ না, একজন গুপ্তচর লুকিয়ে ছিল। আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনেছে সে, তারপর জানিয়ে দিয়েছে রাজাকে। সকাল না হতেই একদল যোদ্ধাকে পাঠানো হয়েছিল পুরো গ্রামকে শাস্তি দেবার জন্য। গিতা ওদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল বাড়ির দরজায়, আমি পিছনের দেয়াল ফুটো করে বেরিয়ে এসেছি সিনালাকে নিয়ে। বাচ্চার জন্য প্রাণ দিয়েছে আমার মেয়ে, বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে ওকে খুন করেছে যোদ্ধারা। আমি পালিয়ে এসেছি। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম গত চব্বিশ ঘণ্টা, ভেবেছিলাম গোলমাল থামলে নদী পেরিয়ে নেটালে চলে যাব। কিন্তু তোমাদের সৈন্যরা আমার খোঁজ পেয়ে গেল। তারপরেও হয়তো পালাতে পারতাম, কিন্তু বাচ্চাটা বড্ড ভারী।" একটু থামল ও দম ফিরে পাবার জন্য। তারপর বলল, "ওকে কিছু খেতে দিয়ো, মাকুমাজান। কাল থেকে বেচারার পেটে কিছুই পড়েনি।" কথা আটকে যেতে শুরু করেছে বৃদ্ধের। "বিদায়, শেষ পর্যন্ত ক্লান্তির কাছে হার মানতেই হলো আমাকে। সান্ত্বনা একটাই—আমার শেষ দৌড় বৃথা যায়নি।" একটা হাত তুলে সিনালাকে শেষবার আদর করল। তারপর ফিরল আমার দিকে। "তোমার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যেয়ো না, মাকুমাজান। আমার নাতির নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব এখন তোমার কাঁধে।"

'কথাটা শেষ করেই নেতিয়ে পড়ল বুড়ো মানুষটা। নিথর হয়ে গেল ওর দেহ।

'এভাবেই মারা গেল হরিণ মাগেপা। পিঠে বোঝা নিয়ে কাউকে এত দ্রুত ছুটতে দেখিনি আমি আর কখনও। আর

সাহসিকতা... বা আত্মত্যাগ, দুটোরই চরম পরাকাষ্ঠা দেখেছি ওর মাঝে। নাতির জন্য প্রাণ দিয়েছিল ও... বুক পেতে দিয়েছিল বর্শার সামনে। এর কোনও তুলনা হয় না।'

মাথা নামিয়ে ফেললেন কোয়াটারমেইন। পুরনো সেই স্মৃতি সম্ভবত দুঃখ জাগিয়ে দিয়েছে তাঁর বুকে।

'সিনালা এখন কোথায়?' জানতে চাইলাম আমি।

'নেটালের এক অনাথাশ্রমে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম ওকে,' বললেন কোয়াটারমেইন। 'কয়েক বছর পর ওর কিছু সম্পত্তিও পুনরুদ্ধার করে দিয়েছিলাম। যদ্দূর জানি, এখন ও দোভাষী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে নেটালেই।'

***

The Online Library of Bangla Books